خاوف ও রাযা

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا وَ نَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا

অর্থাৎ- সেই দিন দয়াময়ের নিকট পরহেজগারদিগকে অতিথিরূপে সমবেত করিব এবং অপরাধীদিগকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যাইব।

আজাবের ভয় ও রহমতের আশা

মূল

ইমাম গায্যালী (রহঃ)

অনুবাদ

মোহাম্মদ খালেদ

প্রকাশনায়ঃ

মোহাম্মদী লাইব্রেরী

চকবাজার, ঢাকা - ১২১১

অনুবাদকের আরজ

বিশ্ব নন্দিত মুসলিম দার্শনিক হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গায্‌যালীর পরিচয় আজ আর নূতন করিয়া বলিবার অপেক্ষা রাখে না। কী মুসলিম, কী অমুসলিম পৃথিবীর প্রায় সকল জনপদেই তিনি ইসলামের একজন খাঁটি সেবক এবং মুসলমানদের আধ্যাত্মিক মুরব্বী হিসাবে পরিচিত। মানুষের আত্মার সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাধিসমূহের চুলচেরা বিশ্লেষণ এবং ইসলামের দৃষ্টিতে উহার সহজ প্রতিকার উপস্থাপনে তাঁহার রচনা-সম্ভার ইতিহাসের এক যুগান্তকারী ঘটনা হিসাবে স্বীকৃত হইয়াছে। "খওফ ও রাযা" তাঁহার এই জাতীয় রচনারই একটি অংশ।

"আজাবের ভয় ও রহমতের আশা" উপরোক্ত কিতাবেরই সরল বঙ্গানুবাদ। এই মূল্যবান কিতাবটি অনুবাদ করার সুযোগ পাইয়া আমি অধম আল্লাহ পাকের দরবারে অশেষ শোকর আদায় করিতেছি। অনুবাদের ক্ষেত্রে সর্বতোভাবেই মূল ধারা অক্ষুণ্ণ রাখার চেষ্টা করা হইয়াছে। তথাপি কোথাও অনুবাদসূলভ কোন বিচ্যুতি ঘটে নাই- এমন দাবী আমি করি না। বরং আমার জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি থাকাই স্বাভাবিক। এই ক্ষেত্রে আমি মহানুভব পাঠকবর্গের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টি ও সংশোধনীমূলক পরামর্শ কামনা করিব। পাঠকবর্গ এই কিতাবটি দ্বারা কিছুমাত্র উপকৃত হইলে আমাদের শ্রম স্বার্থক হইবে।

আল্লাহ পাক আমাদের এই ক্ষুদ্র মেহনতকে কবুল করুন এবং কিতাবটিকে সংশ্লিষ্ট সকলের জন্য নাজাতের উছিলা করিয়া দিন। আমীন, ইয়া রাব্বাল আলামীন!

বিনীত-
মোহাম্মদ খালেদ
কুমিল্লাপাড়া, কামরাঙ্গীর চর
আশরাফাবাদ, ঢাকা- ১৩১০

তারিখ
১লা সেপ্টেম্বর
১৯৯৮ ইং

সূচীপত্র

বিষয় ঃ | পৃষ্ঠা ঃ

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ
نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ *

আজাবের ভয় ও রহমতের আশা

খওফ ও রাযা

আল্লাহ পাকের নৈকট্যপ্রাপ্ত ও প্রিয় বান্দাগণ সর্বদা আল্লাহর রহমতের আশা ও রাযা এবং আল্লাহর আজাব ও গজবের খওফ ও ভয় অন্তরে পোষণ করেন। এই খওফ ও রাযা তথা ভয় ও আশা এমন দুইটি ডানা যাহা দ্বারা আল্লাহর মোকাররাব ও নৈকট্যশীল বান্দাগণ উচ্চতর মোকাম পর্যন্ত উড্ডয়নে সক্ষম হন; কিংবা উহা এমন সওয়ারী যাহাতে আরোহণ করিলে পরকালের দুর্গম ঘাঁটীসমূহ অতিক্রম করা যায়। আল্লাহ পাকের নৈকট্য এবং চিরস্থায়ী সুখ ও শান্তির সুবিস্তৃত উদ্যান কোন অনায়াসলব্ধ বস্তু নহে। উহা বরং মনের বিপরীত কর্ম ও বহুবিধ শারীরিক মেহনত মোশাক্কাতের আবরণে আচ্ছাদিত। রাযা তথা আল্লাহর রহমতের দৃঢ় আশা ব্যতীত সেই মোকাম পর্যন্ত পৌঁছা অসম্ভব বটে। অনুরূপভাবে জাহান্নামের আগুন সূক্ষ্ম কাম-প্রবৃত্তি, সুখ-সম্ভোগ ও আনন্দ-ফুর্তির মোহনীয় আবরণে আবৃত। আল্লাহর আজাবের খওফ ও ভয়ের চাবুক ব্যতীত খাহেশাতে নফসানীর এই মায়াবী জাল ছিন্ন করা সম্ভব হয় না।

সুতরাং পরস্পর বিরোধী এই দুইটি বিষয়ের হাকীকত এবং উহার স্বরূপ সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা লাভ করা অতীব জরুরী। নিম্নে পৃথক দুইটি পরিচ্ছেদে এই বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইল।

প্রথম পরিচ্ছেদ

রাযা

উপরে রাযা-এর পরিচয়ের উপর কিছুটা আলোকপাত করা হইয়াছে। ছালেক্বীন ও তালেবীন তথা যাহারা আধ্যাত্মিক পথের সাধক ও পথিক, এই রাযা হইল তাহাদের হাল ও মোকাম। হাল ও মোকামের পরিচয় হইল— আধ্যাত্মিক পথের সাধকের মধ্যে কোন গুণ যখন স্থায়ী ও বদ্ধমূল হইয়া যায় তখন উহাকে মোকাম বলা হয়। আর সাধকের যেই গুণটি উৎপত্তির পর সহসা বিলীন হইয়া যায়, উহা হাল। যেমন হলদে বর্ণ তিন প্রকার হইয়া থাকে। প্রথমতঃ স্বর্ণের হলদে বর্ণ। ইহা স্থায়ী ও অবিলীয়মান। দ্বিতীয়তঃ আকস্মিক ভয় ও খওফের সময়ও মানুষের চেহারা হলদে ও পাণ্ডবর্ণ ধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহা অস্থায়ী ও দ্রুত বিলীয়মান। এই বর্ণের তৃতীয় অবস্থা হইল যাহা দ্রুত বিলীয়মানও নহে আবার স্থায়ীও নহে। যেমন রোগ-ব্যাধির কারণে সৃষ্ট মানুষের চেহারার হলদে ও ফ্যাকাসে বর্ণ। অনুরূপভাবে মানুষের কলব ও হৃদয়েরও এমন কিছু অবস্থা আছে। এই অবস্থার কোনটি স্থায়ী আবার কোনটি নেহায়েতই সাময়িক। কলবের যেই গুণ ও সিফাতটি স্থায়ী নহে উহাই 'হাল'। এই হাল বিবর্তনশীল এবং ইহা ভাব ও আবেগের সময় মানব হৃদয়ে সৃষ্ট একটি সাময়িক অবস্থার নাম, যাহা হঠাৎ সৃষ্টি হইয়া আবার সহসাই মিলিয়া যায়। কলবের এই অবস্থাটি প্রায় সকল মানুষের মধ্যেই বিদ্যমান। কিন্তু এখানে আমাদের আলোচ্য বিষয় যেহেতু 'রাযা' সুতরাং এক্ষণে এই বিষয়ের উপর আলোকপাত করা হইতেছে।

রাযার মধ্যে এলেম, হাল ও আমল এই তিনটি বিষয় বিদ্যমান। এলেম হইতে হাল এবং হাল হইতে আমল উৎসারিত। কিন্তু এখানে কেবল হালকেই রিজা বলা হয়। কারণ মানুষের প্রিয় কিংবা অপ্রিয় বস্তু হয় অতীত কালে অস্তিত্ব লাভ করিবে কিংবা বর্তমান বা ভবিষ্যত কালে। যদি অতীত কালে অস্তিত্বপ্রাপ্ত কোন বস্তুর ধ্যান অন্তরে আসে তবে উহাকে জিকির-তাজাক্কুর বা স্মরণ করা বলা হয়। আর অন্তরে ধ্যানকৃত সেই বস্তুটি যদি বর্তমান কালে হয় তবে উহাকে 'ওজদ' (ধর্মীয় চিন্তায় মূর্ছাগত হওয়া) ও 'জওক' (আস্বাদন-ক্ষমতা) বলা হয়। আর অন্তরে কোন বস্তুর আশংকা যদি ভবিষ্যত কালে হয় এবং উহা যদি অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে তবে উহাকে এন্তেজার ও তাওয়াক্কু' (অপেক্ষা ও আশা) বলা হয়। এক্ষণে যেই বস্তুর এন্তেজার বা অপেক্ষা করা হয় উহা যদি কোন অশুভ বিষয় হইয়া মানসিক পীড়ার কারণ হয় তবে উহাকে বলা হয় 'খওফ' বা ভয়। পক্ষান্তরে সেই বস্তুটি যদি এমন মাহবুব ও প্রিয় হয় যে, উহার ধ্যান ও কল্পনায় অন্তরে সুখ অনুভব হয় তবে এই সুখ অর্জন করার নামই রিজা। সুতরাং রিজা মানব হৃদয়ের এমন প্রিয় ও কাম্য বস্তুকে বলা হয় যার অপেক্ষায় হৃদয়ে আনন্দ ও সুখ অনুভব হয়।

প্রকাশ থাকে যে, মানুষ যখন অন্তরে কোন প্রিয় বস্তুর আশা করিবে, তখন ঐ আশা ও এন্তেজারের পিছনে নিশ্চয়ই কোন কারণ বিদ্যমান থাকিবে। যদি এই কারণে আশা করা হয় যে, উহা লাভ করার অধিকাংশ উপকরণও তাহার নিকট বিদ্যমান আছে, তবে এইরূপ আশাকে 'রিজা' বলা যথার্থ হইবে। আর উপকরণ ও ছামান যদি কিছু না থাকে কিংবা কোন উপকরণ থাকিলেও উহা যদি কার্যক্ষম না হয়, তবে এইরূপ আশাকে বোকামীই বলিতে হইবে। আর উপকরণের অস্তিত্ব যদি জানা না থাকে এবং উপকরণ যে নাই এই কথাও যদি জানা না থাকে তবে এইরূপ আশা ও এন্তেজারকে 'তামান্না' বা 'বাসনা' বলা হয়।

মোটকথা, রিজা ও খওফ এমন বিষয়কে বলা হয় যাহা লাভ করা নিশ্চিত নহে। যাহা লাভ করা নিশ্চিত, সেই ক্ষেত্রে উহাকে রিজা বলা হয় না। যেমন সূর্য উদয়ের সময় আমরা এমন বলি না যে, আমরা সূর্য উদয়ের আশা বা রিজা করিতেছি। কিংবা সূর্য অস্ত যাওয়ার সময়ও এমন বলা হয় না যে, আমরা সূর্য ডুবিয়া যাওয়ার খওফ বা আশংকা করিতেছি। কেননা, সূর্যের উদয়াস্ত একটি নিশ্চিত বিষয়। এই ক্ষেত্রে সন্দেহের কোন অবকাশ নাই। তবে সন্দেহযুক্ত বিষয় যেমন বৃষ্টি বা খরা সম্পর্কে এমন বলা যাইবে যে, আমরা বৃষ্টি বর্ষণের আশা বা খরার আশংকা করিতেছি।

ইহা স্পষ্ট কথা যে, দুনিয়া হইল আখেরাতের ফসল উৎপাদনের কর্মক্ষেত্র। অন্তর যেন উহার জমিন, ঈমান হইল বীজ এবং আল্লাহর আনুগত্য ও এবাদত হইল হাল চালানো এবং খাল কাটিয়া সেচ ব্যবস্থার মত। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি দুনিয়ার লোভ-লালসায় আসক্ত, তাহার অন্তর যেন লবণাক্ত ভূমি— যেই ভুমিতে বীজ গজায় না। আখেরাত হইল শস্য কাটার দিন। দুনিয়াতে যে যেই বীজ বপন করিবে, আখেরাতে সে উহাই কাটিয়া লইবে। আখেরাতের শস্যক্ষেত্রে ঈমানরূপী বীজ ব্যতীত যেমন ফসল হয় না, তদ্রূপ অন্তরের মলীনতা ও বদ আখলাকের কারণে ঈমানের বীজ বিশেষ ফলপ্রদ হয় না। যেমন লবণাক্ত জমিনে বীজ অঙ্কুরিত হয় না।

তো আল্লাহ পাকের যেই বান্দা মাগফেরাতের প্রত্যাশা করে তাহার অবস্থা

যেন শস্য ক্ষেত্রের মালিকের মত। অর্থাৎ, কোন কৃষক যদি উত্তম শস্যক্ষেত্র নির্বাচনপূর্বক উহাতে উন্নত বীজ বপন করিয়া যথাসময় পানি সেচন এবং আগাছা-পরগাছা পরিষ্কার করিয়া যথাযথভাবে উহার পরিচর্যাপূর্বক আল্লাহ পাকের নিকট আশা করে যে, আমাকে ফসল দান কর; তবে তাহার এই আশাকে 'রিজা' বলা হইবে। পক্ষান্তরে যদি কেহ এমন কোন লবণাক্ত ভূমিতে বীজ বপন করে, যেখানে পানি পৌঁছানো যায় না এবং বীজ বপনের পর উহার কোন যত্নও লওয়া হয় না, অতঃপর যদি ঐ ক্ষেত্র হইতে ফসল পাওয়ার আশা করা হয় তবে তাহার এই আশা ও অপেক্ষাকে রিজা বলা হইবে না। বরং এমন অলীক আশা পোষণকারীকে আহাম্মক ও নির্বোধই বলা হইবে। অবশ্য কেহ যদি ভাল বীজ বপনের পর উহাতে পানি সেচন না করিয়া এমন মৌসুমে বৃষ্টির অপেক্ষা করে, যেই মৌসুমে সাধারণতঃ বৃষ্টি বর্ষণ হয় না বটে তবে বর্ষণ হইতে কোন বাধাও নাই; এইরূপে অপেক্ষা ও আশাকেও রিজা বলা হইবে না। ইহা বরং তামান্না বা বাসনা।

উপরের বিশ্লেষণ দ্বারা জানা গেল যে, রিজা কেবল সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তুর আশা ও অপেক্ষাকেই বলা হইবে যেই ক্ষেত্রে বান্দা তাহার এখতিয়ারভুক্ত যাবতীয় উপায়-উপকরণ অবলম্বন সম্পন্ন করিবার পর কেবল এমন বিষয়গুলিই অবশিষ্ট থাকিবে যাহা মানব ক্ষমতার ঊর্ধ্বে।

অনুরূপভাবে বান্দা যদি দিলের শস্যক্ষেত্রে ঈমানের বীজ বপন করিয়া উহাতে এতাআত ও এবাদতের পানি সিঞ্চন করে এবং বদ-আখলাক ও শরীয়তগর্হিত আচার-আচরণের আগাছা হইতে উহাকে পরিষ্কার রাখিয়া আল্লাহ পাকের দরবারে মৃত্যু পর্যন্ত ঈমানের উপর কায়েম থাকার এবং খাতেমা বিলখায়ের বা মঙ্গলজনক মৃত্যুর অপেক্ষায় থাকে, তবে বান্দার এই আশা ও অপেক্ষাকেই হাকীকী ও যথার্থ রিজা বলা হইবে। এই ক্ষেত্রে মউত পর্যন্ত এমন সব আমলের উপর জমিয়া থাকিতে হইবে যাহা দ্বারা 'মাগফেরাতে কামেলা' বা পরিপূর্ণ ক্ষমা নসীব হয়। পক্ষান্তরে যদি আমলের উপর জমিয়া না থাকা হয়, অর্থাৎ ঈমানের বীজ বপনের পর যদি উহার সযত্ন পরিচর্যা করা না হয়; যেমন সময় মত উহাতে পানি না দেওয়া, শরীয়তগর্হিত আচার-আচরণ এবং পার্থিব সুখ-সম্ভোগ ও ভোগ-বিলাসে লিপ্ত থাকা ইত্যাদি গাফলতে নিমজ্জিত থাকার পর যদি আল্লাহর ক্ষমা ও মাগফেরাতের অপেক্ষা করা হয়, তবে ইহা নিছক বোকামী ও প্রতারণা ছাড়া আর কিছুই নহে। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেছেন–

الاحمق من اتبع نفسه هواها و تمنى على الله

অর্থাৎ– ঐ ব্যক্তি নির্বোধ যে নিজের নফসের আনুগত্য করে আর আল্লাহ পাকের নিকট মাগফেরাত কামনা করে।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَضَاعُو الصَّلٰوةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ

অর্থ ঃ অতঃপর তাহাদের পরে আসিল অপদার্থ পরবর্তীরা। তাহারা নামাজ নষ্ট করিল এবং কুপ্রবৃত্তির অনুবর্তী হইল। সুতরাং তাহারা অচিরেই পথভ্রষ্টতা প্রত্যক্ষ করিবে।

অন্য আয়াতে আছে–

فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ وَّرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُوْنَ عَرَضَ هٰذِهِ الْاَدْنٰى وَ يَقُوْلُوْنَ سَيُغْفَرُ لَنَا

অর্থ ঃ অতঃপর তাহাদের স্থলে আল্লাহর কিতাবের অযোগ্য উত্তরাধিকারীরা আসিল। তাহারা এই হীন জীবনের ছামান গ্রহণ করিত এবং বলিত, আমাদিগকে ক্ষমা করা হইবে।

উদ্যানের মালিকের নিন্দা করিয়া পবিত্র কোরআনে বলা হইয়াছে, সে যখন উদ্যানে গমন করিল তখন বলিল–

مَا اَظُنُّ أَنْ تَبِيْدَ هٰذِهٖ أَبَدًا * وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِنْ رُّدِدْتُّ إِلٰى رَبِّىْ لَأَجِدَنَّ خَيْرًا مِّنْهَا مُنْقَلَبًا *

অর্থ ঃ আমার মনে হয় না যে, এই বাগান কখনো ধ্বংস হইয়া যাইবে এবং আমি মনে করি না যে, কেয়ামত অনুষ্ঠিত হইবে। যদি কখনো আমার পালনকর্তার নিকট আমাকে পৌঁছাইয়া দেওয়া হয় তবে সেখানে ইহার চাইতে উৎকৃষ্ট পাইব।

মোটকথা, যেই ব্যক্তি নিজেকে যাবতীয় পাপাচার ও গোনাহ্-খাতা হইতে রক্ষা করিয়া আল্লাহ পাকের এতাআত ও আনুগত্যে সচেষ্ট হইবে, সেই ব্যক্তিকেই আল্লাহ পাকের পরিপূর্ণ নেয়মত লাভের আশা পোষণ করার যোগ্য মনে করা হইবে। অবশ্য জান্নাতে প্রবেশ করার পরই আল্লাহর নেয়মত পরিপূর্ণ হইবে। কোন গোনাহগার যদি নিজের গোনাহ-খাতার জন্য তওবা করে এবং নিজের কৃত অপরাধের ক্ষতিপূরণ করিয়া লয়, তবে তাহার পক্ষে তওবা কবুল

হওয়ার আশা করা সঙ্গত হইবে।

তওবা করার পূর্বে কোন গোনাহগার যদি গোনাহের প্রতি ঘৃণা ও নেক আমলের প্রতি সন্তুষ্টি পোষণ করতঃ নিজেকে তিরস্কার করে এবং তওবা করার ইচ্ছা রাখে তবে এমন ব্যক্তি তওবা নসীব হওয়ার আশা করার যোগ্য। কেননা, 'গোনাহকে ঘৃণা করা এবং তওবার ইচ্ছা পোষণ করা' ইহা বান্দাকে তওবা পর্যন্ত পৌছাইয়া দেওয়ার উপকরণ।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে-

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَ الَّذِينَ هَاجَرُوا وَ جَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَةَ اللَّهِ *

অর্থ ঃ নিশ্চয়ই ঈমানদারগণ এবং যাহারা হিজরত করিয়াছে এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করিয়াছে, তাহারাই আল্লাহর রহমতের আশা করিতে পারে।

অর্থাৎ, এই সকল লোকেরাই আশা করার যোগ্য। এমন নহে যে, কেবল এই সকল লোকদের মধ্যেই আশার অস্তিত্ব বিদ্যমান। কেননা, যাহাদের মধ্যে বর্ণিত গুণাবলি নাই তাহারাও আশা পোষণ করে। কিন্তু আশা পোষণ করার যথার্থ যোগ্য ব্যক্তি কেবল তাহারাই যাহাদের মধ্যে বর্ণিত গুণাবলি পাওয়া যাইবে। যেই ব্যক্তি এমন কার্যকলাপে নিমগ্ন যাহা আল্লাহ পাকের পছন্দ নহে, আর সে নিজের কৃত অপরাধের জন্য নিজেকে তিরস্কারও করে না এবং তওবা করিয়া সুপথে ফিরিয়া আসার ইচ্ছাও পোষণ করে না, এমন ব্যক্তির পক্ষে আল্লাহর মাগফেরাত ও ক্ষমার আশা পোষণ করা বোকামীই বটে। যেমন ঐ ব্যক্তিও প্রবলভাবে ফসল প্রাপ্তির 'রিজা' বা আশা পোষণ করা অসঙ্গত বলিয়া সাব্যস্ত, যে লবণাক্ত জমিনে বীজ বপন করিল এবং বীজ বপন করার পর আর উহার কোন যত্ন লইল না।

হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন মোয়াজ বলেন, চরম নির্বুদ্ধিতা হইল, "আল্লাহ পাক ক্ষমা করিয়া দিবেন" এই আশায় গোনাহ করিতে থাকা এবং নিজের গোনাহের জন্য অনুতপ্ত না হওয়া, এবাদত ও আনুগত্য ছাড়াই আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্তির আশা পোষণ করা, জাহান্নামের আগুনের বীজ বপন করিয়া জান্নাতের প্রত্যাশা করা, গোনাহের বিনিময়ে মুতী'-ফরমাবরদার ও আনুগত্যশীল বান্দাদের মোকাম কামনা করা, আমল ছাড়া ছাওয়াবের আশা করা এবং সীমা লংঘন করার পরও আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে কিছু পাওয়ার আশা করা।

উপরের পর্যালোচনা দ্বারা এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, রিজা এলেমের এমন একটি হালাত যাহা অধিকাংশ আছবাব হাসিল করার পর অন্তরে পয়দা হয়। এই হালাতের দাবী হইল- অবশিষ্ট আছবাব ও উপকরণসমূহ যাহা এখনো হাসিল হয় নাই উহা হাসিল করার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রচেষ্টা চালাইয়া যাওয়া। যেমন- উপরের দৃষ্টান্তে বলা হইয়াছে যেই ব্যক্তি উত্তম বীজ বপন করিবে, ভূমিও উর্বর হইবে এবং উহাতে পর্যাপ্ত পানি দিবে (অতঃপর সেই ব্যক্তি যদি ঐ জমিন হইতে ভাল ফসল উৎপাদনের আশা ও রিজা করে তবে) তাহার রিজা হইবে খাঁটি। এই রিজা তাহাকে জমিনের সঠিক পরিচর্যায় উদ্বুদ্ধ করিয়া ফসল কাটার সময় পর্যন্ত উহার রক্ষণাবেক্ষণে তৎপর রাখিবে। এই রিজার বিপরীত হইল নৈরাশ্য। এই নৈরাশ্য যাহার মধ্যে বিরাজ করিবে তাহার দ্বারা কখনো জমিনের দেখাশোনা হইতে পারে না।

উদাহরণ স্বরূপঃ যেই ব্যক্তি ইহা জানে যে, তাহার ভূমিটি লবণাক্ত এবং উহাতে পানি দেওয়াও সম্ভব নহে, ফলে এই জমিনে বীজ অঙ্কুরিত হইয়া ফসল উৎপাদনেরও কোন আশা নাই, সে কখনো ঐ জমিনের পিছনে মেহনত করিতে সম্মত হইবে না। রিজা হইল উত্তম বিষয়। কেননা, ইহা মানুষকে আমলে উৎসাহিত করে। আর নৈরাশ্য হইল রিজার বিপরীত ও মন্দ বিষয়। কেননা, ইহা মানুষকে আমল ও কর্মতৎপরতা হইতে বিরত রাখে। এদিকে খওফ ও ভয় রিজার বিপরীত নহে। বরং খওফ হইল রিজার বন্ধু ও সহযোগী শক্তি এবং স্বতন্ত্রভাবেই মানুষকে কর্মে উৎসাহ যোগায়।

মোটকথা, রিজা হইতে সৃষ্ট অবস্থার অবশ্যম্ভাবী ফল হইল, মনের মাঝে এমন এক শওক পয়দা হওয়া যেন আমলের মধ্যে খুব মোজাহাদা করা হয় এবং আমল দ্বারা যেই হালাতই পয়দা হউক কোন অবস্থাতেই আমলের গতি ব্যহত হইতে না দেওয়া। অর্থাৎ, রিজাকারীর মধ্যে যখন এই অবস্থা পয়দা হইবে, তখন উহার ফলশ্রুতিতে সে সর্বদা আল্লাহ পাকের দিকে নিবিষ্ট থাকিতে আনন্দ পাইবে এবং অতীব বিনয়ের সহিত আল্লাহ পাকের খোশামোদ করিতে থাকিবে। এই অবস্থাটি তো বরং সেই ব্যক্তির মাঝেও প্রকাশ পাইবে, যেই ব্যক্তি দুনিয়ার কোন রাজার নিকট রিজা করে। সুতরাং যিনি সকল রাজার রাজা, সেই মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট রিজা করিলে তাহার মধ্যে উহা প্রকাশ না হওয়ার সঙ্গত কোন কারণ নাই। সুতরাং কাহারো মধ্যে যদি উহা প্রকাশ না পায়, তবে উহা এই কথাই প্রমাণ করিবে যে, সেই ব্যক্তি এখনো রিজার প্রকৃত মোকামে পৌছাইতে সক্ষম হয় নাই।

হযরত জায়েদ ইবনে খায়েল (রাঃ) বর্ণনা করেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলাম, আমি আপনার নিকট এই কথা জানিতে আসিয়াছি যে, আল্লাহ পাক যেই ব্যক্তির ভালাই চাহেন তাহার পরিচয় কি এবং যেই ব্যক্তি এইরূপ নহে তাহার লক্ষণই বা কি? আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমার অবস্থা কি? আমি আরজ করিলাম, আমার অবস্থা হইল– আমি সৎকর্ম ও সৎকর্মপরায়ণ লোককে ভালবাসি। কোন ভাল কাজ করার সুযোগ হইলে অনতিবিলম্বে উহা সম্পাদন করি এবং উহার ছাওয়াবের একীন রাখি। কোন ভাল কাজের সুযোগ নষ্ট হইয়া গেলে উহার জন্য আক্ষেপ করি এবং উহার আগ্রহ রাখি। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইরেন, ইহাই সেই ব্যক্তির আলামত– আল্লাহ পাক যাহার ভালাই ও মঙ্গল চাহেন। আল্লাহ পাক যদি তোমার জন্য অন্য কিছু চাহিতেন তবে উহার জন্য তোমাকে প্রস্তুত করিতেন এবং অতঃপর তুমি কোন্ বনে হারাইয়া গিয়াছ উহার পরওয়া করিতেন না।

উপরোক্ত হাদীসে আহলে খায়ের ও সৎলোকদের পরিচয় বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে যদি কেহ সৎলোকদের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার রিজা বা আশা করে, আর তাহার মধ্যে যদি বর্ণিত আলামত বর্তমান না থাকে তবে সে প্রতারিত।

রিজার ফজিলত

রিজার সহিত আমল করা– খওফের সহিত আমল করা অপেক্ষা উত্তম। কারণ, যেই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সঙ্গে অধিক মোহাব্বত রাখে সেই ব্যক্তিই তাহার নৈকট্যশীল হয়। আর ইহা সুস্পষ্ট যে, রিজার সহিতই মোহাব্বত বেশী হইয়া থাকে। যেমন দুইজন বাদশাহের মধ্যে মানুষ একজনের আনুগত্য করে তাহার ভয়ের কারণে এবং অপরজনের আনুগত্য করে তাহার কৃপা লাভের আশায়। এই ক্ষেত্রে শেষোক্ত বাদশাহের প্রতিই মোহাব্বত বেশী হইবে (এবং এই মোহাব্বত হইবে অকৃত্রিম)। এই কারণেই শরীয়তে রিজা ও 'হুসনে জন' (সুধারণা)-এর প্রতি বিশেষ উৎসাহবাণী আসিয়াছে। বিশেষতঃ মউতের ক্ষেত্রে এই রিজা ও হুসনে জনের বাণী সবিশেষ গুরুত্বের সহিত বিবৃত হইয়াছে। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

لا تقنطو من رحمة الله

অর্থাৎ– "তোমরা আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না।"

এই আয়াতে কোন বিষয়ে নিরাশ হইতে নিষেধ করা হইয়াছে।

আল্লাহ পাক হযরত ইয়াকুব (আঃ)-এর প্রতি ওহী নাজিল করিলেন, আপনি জানেন, আমি আপনার ও ইউসুফের মাঝে কেন বিচ্ছেদের প্রাচীর দাঁড় করাইয়াছিলাম? উহার কারণ এই যে, আপনি বলিয়াছিলেন–

وَ اَخَافُ اَنْ يَّاْكُلَهُ الذِّئْبُ وَ اَنْتُمْ عَنْهُ غٰفِلُوْنَ *

অর্থ ঃ "আমি আশঙ্কা করি যে, ব্যাঘ্র তাহাকে খাইয়া ফেলিবে এবং তোমরা তাহার দিক হইতে গাফেল থাকিবে।"

আপনি বাঘের ভয় করিলেন কিন্তু আমার নিকট রিজা করিলেন না কেন? আপনি ইউসুফের ভাইদের অসাবধানতার প্রতি নজর দিয়াছেন অথচ আমার হেফাজতের কথা ভাবিয়া দেখেন নাই।

নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

لا يموتن احدكم و هو يحسن الظن بالله تعالى

অর্থাৎ– তোমাদের যে কেহ মৃত্যুবরণ করে, সে যেন আল্লাহ পাকের প্রতি সুধারণাই রাখে।

হাদীসে কুদসীতে আল্লাহ পাক এরশাদ করেন–

انا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء

অর্থাৎ– আমি আমার বান্দার ধারণার সঙ্গে থাকি। সুতরাং সে আমার প্রতি যেমন ইচ্ছা তেমনই ধারণা পোষণ করুক।

একদা পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির নিকট তাশরীফ লইয়া গেলেন। লোকটির তখন অন্তিম সময়। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, এখন তোমার কি অবস্থা? সে আরজ করিল, নিজের গোনাহের জন্য ভয় হইতেছে এবং আল্লাহর রহমতের আশাও পোষণ করিতেছি। এইবার তিনি এরশাদ করিলেন, এই সময় যেই বান্দার মাঝে এই দুইটি অবস্থা (খওফ ও রিজা) একত্রিত থাকে, আল্লাহ পাক সেই বান্দাকে তাহার ইপ্সিত বস্তু দান করেন এবং বান্দা যেই বিষয়কে ভয় করে সেই বিষয় হইতে তাহাকে নিরাপদ রাখেন।

জনৈক মহা পাপী নিজের পাপের কারণে ভীত সন্ত্রস্ত হইয়া একেবারে নিরাশ হইয়া পড়িয়াছিল। হযরত আলী (রাঃ) সেই লোকটিকে বলিলেন, তোমার এই নৈরাশ্যই তোমার সবচাইতে বড় গোনাহ।

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, কোন ব্যক্তি যদি গোনাহ করিয়া এইরূপ মনে করে যে, আল্লাহ তাহাকে উহার ক্ষমতা দিয়াছেন, (অর্থাৎ, এই বিষয়ে সে স্বাধীন ছিল এবং ইচ্ছা করিয়াই সে ঐ গোনাহ করিয়াছে)। অতঃপর যদি সে আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা পাওয়ার আশা করে, তবে আল্লাহ পাক তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন। পবিত্র কোরআনে আল্লাহ পাক এক কওমের দোষ এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।

ذٰلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِيْ ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ اَرْدٰكُمْ

অর্থাৎ– "তোমরা তোমাদের রবের প্রতি যেই ধারণা পোষণ করিতে উহাই তোমাদিগকে ধ্বংস করিয়াছে।"

অন্য আয়াতে বলা হইয়াছে–

وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ وَكُنْتُمْ قَوْمًا بُوْرًا

অর্থাৎ– "তোমরা মন্দ ধারণার বশবর্তী হইয়াছিলে, তোমরা ছিলে ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়।"

হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে– কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক বান্দাকে বলিবেন, ইহার কি কারণ ছিল যে, তুমি মন্দ কাজ হইতে দেখিয়াও নিষেধ কর নাই? সেই সময় যদি আল্লাহ পাক বান্দাকে জবাব দেওয়ার তাওফীক দেন তবে সে আরজ করিবে, আয় পরওয়ারদিগার! আমি তোমার নিকট রিজা এবং মানুষকে খওফ করিয়াছিলাম। আল্লাহ বলিবেন, হে বান্দা! আমি তোমার অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিলাম।

অন্য হাদীসে আছে– এক ব্যক্তি সর্বদা মানুষকে করজ দিত। করজ পরিশোধের বেলায় সে বিত্তবানদিগকে সময় দিত আর গরীবদিগকে ক্ষমা করিয়া দিত। এই ব্যক্তি যখন আল্লাহ পাকের দরবারে হাজির হইল তখন তাহার নিকট কোন আমল ছিল না। অর্থাৎ, সে আল্লাহ পাকের কোন আনুগত্য ও এবাদত করে নাই। কিন্তু সে আল্লাহ পাকের নিকট রিজা এবং তাঁহার সম্পর্কে সুধারণা পোষণ করিত। অবশেষে তাহাকেও ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইল।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ يَتْلُوْنَ كِتٰبَ اللّٰهِ وَاَقَامُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْفَقُوْا مِمَّا رَزَقْنٰهُمْ سِرًّا

وَّعَلَانِيَةً يَّرْجُوْنَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُوْرَ ۞

অর্থ ঃ যাহারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামাজ কায়েম করে এবং আমি

যাহা দিয়াছি তাহা হইতে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে, তাহারা এমন ব্যবসা আশা করে যাহাতে কখনো লোকসান হইবে না।

একদা পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবায়ে কেরামকে বলিলেন, আমি যাহা জানি তাহা যদি তোমরা জানিতে পারিতে, তবে তোমরা কম হাসিতে, বেশী ক্রন্দন করিতে, বনে-জঙ্গলে ফিরিয়া আপন বক্ষে করাঘাত করিতে এবং স্বীয় প্রতিপালকের দরবারে চিৎকার করিতে। এমন সময় হযরত জিব্রাঈল (আঃ) তাঁহার খেদমতে আসিয়া আরজ করিলেন, আল্লাহ পাক এরশাদ করিতেছেন যে, তাঁহার বান্দাদিগকে নিরাশ করা হইতেছে কেন? এই পর্যায়ে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবায়ে কেরামের নিকট গিয়া তাহাদিগকে রিজা ও শওকের কথা শোনাইলেন।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, আল্লাহ পাক হযরত দাউদ (আঃ)-এর উপর ওহী নাজিল করিলেন যে, আমাকে ভালবাসুন এবং আমাকে যাহারা মোহাব্বত করে তাহাদিগকেও ভালবাসুন। আর মাখলুকের অন্তরে আমাকে প্রিয় করিয়া তুলুন। হযরত দাউদ (আঃ) আরজ করিলেন, আয় পরওয়ারদিগার! মাখলুকের নিকট আপনাকে কিরূপে প্রিয় করিয়া তুলিব? এরশাদ হইলঃ আমার অনুগ্রহ ও নেয়মতের কথা উল্লেখ করিয়া মানুষের নিকট আমাকে ভালভাবে উপস্থাপন করুন এবং তাহাদিগকে আমার এহ্সান ও অনুগ্রহের কতা ভালভাবে স্মরণ করাইয়া দিন।

কথিত আছে যে, আব্বান ইবনে আবী আয়াশ সর্বদা মানুষকে আল্লাহর রিজা ও আশার বাণী শোনাইতেন। তাহার ইন্তেকালের পর কেহ তাহাকে স্বপ্নে দেখিল যে, তিনি বলিতেছেন, আল্লাহ পাক আমাকে নিজের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি ঐ সকল কথা বলিতে কেন? আমি আরজ করিলাম, আয় মওলায়ে কারীম! আমার উদ্দেশ্য ছিল, মানুষের নিকট তোমাকে প্রিয় করিয়া তোলা। সঙ্গে সঙ্গে হুকুম হইল যাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম।

অনুরূপ অপর একটি ঘটনা এইরূপঃ হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন আকছাম (রহঃ)-এর ইন্তেকালের পর স্বপ্নযোগে কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আল্লাহ পাক আপনার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করিয়াছেন? তিনি বলিলেন, ইন্তেকালের পর আল্লাহ পাক আমাকে তাঁহার সম্মুখে দাঁড় করাইয়া আমার কৃতকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে বৃদ্ধ! তুমি কি এই সকল কাজ করিয়াছ? এই প্রশ্ন শোনার সঙ্গে সঙ্গে আমি কতটা ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম তাহা আল্লাহ

পাকই ভাল জানেন। পরে আমি আরজ করিলাম, আয় পরওয়ারদিগার! হাদীসের মাধ্যমে তো তোমার এই অবস্থার কথা আমার নিকট পৌঁছায় নাই। এরশাদ হইলঃ তবে আমার কোন্ অবস্থার কথা তোমার নিকট পৌঁছিয়াছে? আমি আরজ করিলাম, আমার নিকট হাদীস পৌঁছিয়াছে আব্দুর রাজ্জাক হইতে, তাহার নিকট মা'মার হইতে, তাহার নিকট যুহরী হইতে, তাহার নিকট আনাস হইতে, তাহার নিকট তোমার নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হইতে এবং তাঁহার নিকট জিবরাঈল (আঃ) হইতে যে, তুমি এরশাদ করিয়াছ–

انا عند ظن عبدي بي فليظن ما شاء

অর্থাৎ– আমি আমার বান্দার ধারণার সঙ্গে থাকি। সুতরাং সে আমার প্রতি যেইরূপ ইচ্ছা ধারণা পোষণ করুক।

সুতরাং তোমার প্রতি আমার ধারণা ছিল যে, তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া দিবে। আল্লাহ জাল্লাহ শানুহু এরশাদ ফরমাইলেনঃ জিবরাঈল সত্য বলিয়াছে, যথার্থ বলিয়াছেন আমার নবী, আনাস সত্য বলিয়াছে, যুহরীও সঠিক বলিয়াছে, সত্য বলিয়াছে মা'মার, আব্দুর রাজ্জাকের বক্তব্য সঠিক এবং তুমিও সত্য বলিয়াছ। অতঃপর আমাকে বেহেশতী পোশাক দেওয়া হইল, জান্নাতী সেবকগণ আমার অগ্রে অগ্রে বেহেশত পর্যন্ত চলিল। এই সময় আমি বলিলাম, প্রকৃত শান্তি ইহাকেই বলা হয়।

কথিত আছে যে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি সর্বদা হতাশাব্যঞ্জক কথাবার্তা বলিয়া মানুষকে নিরাশ করিত এবং তাহাদের সঙ্গে দুর্ব্যবহার করিত। কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক তাহাকে বলিবেন, তুমি যেমন আমার বান্দাদিগকে নিরাশ করিয়াছিলে, অনুরূপ আজ আমি তোমাকে আমার রহমত হইতে নিরাশ করিব।

অন্য এক হাদীসে আছেঃ আঁ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, এক ব্যক্তি দোজখে হাজার বৎসর থাকিবে এবং এই সময় সে ইয়া হান্নানু! ইহা মান্নানু! বলিয়া চিৎকার করিয়া আল্লাহ পাককে ডাকিতে থাকিবে। আল্লাহ পাক জিবরাঈল (আঃ)-কে হুকুম করিবেনঃ যাও, আমার বান্দাকে আমার নিকট লইয়া আস। হযরত জিবরাঈল (আঃ) হুকুম পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে লোকটিকে রাব্বুল আলামীনের সম্মুখে আনিয়া হাজির করিবেন। আল্লাহ পাক তাহাকে বলিবেন, তোমার অবস্থানস্থলটির বিবরণ দাও, উহা কেমন জায়গা ছিল। বান্দা আরজ করিবে, এলাহী! উহা বড়ই মন্দ স্থান। এই সময় আল্লাহ পাক পুনরায় হুকুম করিবেন, বান্দাকে সেই আগের স্থানে লইয়া যাও। তাহাকে লইয়া রওনা হওয়ার পর সে বার বার পিছনের দিকে ফিরিয়া তাকাইতে থাকিবে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি বার বার পিছনের দিকে ফিরিয়া কি দেখিতেছ? লোকটি আরজ করিবে, আয় মওলায়ে কারীম! আমি আশা করিয়াছিলাম, ঐ স্থান হইতে বাহির করিবার পর তুমি আমাকে আর সেখানে ফিরাইয়া দিবে না। আল্লাহ রাহমানুর রাহীম হুকুম করিবেন, আমার এই বান্দাকে জান্নাতে লইয়া যাও। এই ঘটনায় দেখা গেল, লোকটির নাজাতের একমাত্র উছিলা হইল রিজা।

রিজা হাসিল করার উপায়

এক শ্রেণীর মানুষ আছে যাহারা চরম নৈরাশ্যের শিকার হওয়ার কারণে এবাদত-বন্দেগী একেবারেই বর্জন করিয়া বসিয়া থাকে। আরেক শ্রেণীর মানুষ হইল, তাহাদের উপর আল্লাহর আজাব ও গজবের ভয় এমন প্রবলভাবে চাপিয়া বসে যে, উহার ফলে তাহারা অহর্নিশ এবাদত-বন্দেগীতে এমন বাড়াবাড়ি করিতে থাকে, যাহার কারণে তাহার নিজের ও পরিবারস্থ অপরাপর লোকদের কষ্ট হইতে থাকে। এই উভয় শ্রেণীর লোকদের জন্যই রিজা অতীব আবশ্যক। ভয়ের কারণে অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি এবং নৈরাশ্যের কারণে কর্তব্যকর্মে অবসাদ ও পশ্চাদ্পদতা– এই উভয় পথই সমতার সীমা লংঘন করিতেছে। সুতরাং সমতা ও ভারসাম্যের পথে ফিরাইয়া আনার জন্য তাহাদের এলাজ ও চিকিৎসা হওয়া আবশ্যক।

যেই ব্যক্তি গোনাহে লিপ্ত থাকিয়া আল্লাহ পাকের নিকট প্রত্যাশা করে এবং এবাদতে বিমুখ হইয়া পাপাচারেই লিপ্ত থাকে এমন ব্যক্তির জন্য রিজা-এর দাওয়াই যেন প্রাণনাশক বিষতুল্য। যেমন স্বভাবে শীতলতায় মধু 'শিফা' বা আরোগ্যকারী। কিন্তু মানব স্বভাবে উষ্ণতার প্রাবল্য হইলে মধু যেন বিষতুল্য। সুতরাং এইরূপ প্রতারিত ব্যক্তিদের জন্য ভয় ও ভয় উৎপাদনকারী বিষয় ব্যতীত অন্য কোন চিকিৎসা কার্যকর নহে। সুতরাং যাহারা ওয়াজ-নসীহত করে তাহাদের করণীয় হইল, প্রথমেই সুনির্দিষ্টভাবে শ্রোতাদের ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করিয়া উহার বিপরীত উপাদান দ্বারা তাহাদের চিকিৎসা করা। এমন কোন চিকিৎসা যেন না করা হয় যাহা দ্বারা তাহাদের রোগ আরো বাড়িয়া যায়।

আমলের ক্ষেত্রে "বাড়াবাড়ি কিংবা মাত্রাতিরিক্ত স্বল্পতা" এই উভয় পন্থা পরিহার করিয়া ভারসাম্যপূর্ণ মধ্যম পন্থা অবলম্বন করাই সকলের জন্য কাম্য। আর যখনই এই মধ্যম পন্থা লংঘিত হইবে তখনই মানুষকে পুনরায় উহাতে

ফিরাইয়া আনার এলাজ করিতে হইবে। এই এলাজ ও চিকিৎসার ক্ষেত্রে এমন পথও অবলম্বন করা চলিবে না, যাহা দ্বারা ভারসাম্য ও সমতার সঙ্গে দূরত্ব আরো বাড়িয়া যায়। বিষয়টা এমনই নাজুক যে, এই পরিস্থিতিতে মানুষের মাঝে রিজার উপকরণ বর্ণনা করা চলিবে না। আবার খওফ ও ভয়ের আলোচনায় অতিরঞ্জন করিলেও তাহাদিগকে সঠিক অবস্থানে ফিরাইয়া আনা দুস্কর হইবে। বিশেষতঃ এই ক্ষেত্রে রিজা এবং উহার উপকরণের আলোচনা মানুষকে তাবাহ ও বরবাদ করিয়া ছাড়ে। কিন্তু শ্রোতাদের নিকট যেহেতু রিজা ও আশার বাণী অধিক প্রিয় ও শ্রুতিমধুর হইয়া থাকে এবং সাধারণ ওয়ায়েজদের উদ্দেশ্যও যেহেতু শ্রোতাদের প্রশংসা কুড়ানোই মুখ্য হয়; এই কারণেই তাহারা রিজার আলোচনাতেই অতিমাত্রায় ঝুকিয়া পড়েন।

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, সেই ব্যক্তিই আলেম, যিনি মানুষকে আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশও করে না আবার তাহার আজাব হইতেও বেপরওয়া করেন না।

আমরা রিজার উপকরণসমূহ এমন ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে আলোচনা করি যাহারা নিরাশ হইয়া পড়িয়াছে। কিংবা যাহাদের উপর খওফ ও ভয় প্রবল। কোরআন-হাদীসের দাবীও ইহাই। কেননা, উহাতেও রিজা ও খওফের আলোচনা পাশাপাশি আসিয়াছে। অর্থাৎ, কোরআন-হাদীসে সকল প্রকার রোগীর আরোগ্য লাভের উপায় বিবৃত হইয়াছে যেন নবীর ওয়ারিশ আলেমগণ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের ন্যায় মানুষের রূহানী ব্যাধির চিকিৎসা করিতে পারেন।

রিজা প্রবল করার উপায়

এক্ষণে আমরা রিজা প্রবল করার উপায় বর্ণনা করিব। অন্তরে রিজার হালাত গালেব ও প্রবল করার উপায় দুইটি। প্রথমতঃ মানুষের জন্য আল্লাহ যেই নেয়মত সৃষ্টি করিয়াছেন সেই অজস্র নেয়মতের কথা চিন্তা করা যে, দুনিয়াতে মানুষের বসবাস ও স্থায়িত্বের জন্য যাহা যাহা জরুরী উহার সবই আল্লাহ ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। যেমন- কাজ করার জন্য হাত, হাতের অঙ্গুলি, নখ, খাদ্যোৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি ইত্যাদি। অনুরূপভাবে তিনি সৌন্দর্য বর্দ্ধনের উপাদানও দান করিয়াছেন। যেমন মানবদেহে যথাস্থানে চোখ স্থাপন করিয়া উহার উপর বক্র ভ্রূ আঁকিয়া দিয়াছেন। তদুপরি চোখের রং করিয়াছেন কয়েক প্রকার এবং ওষ্ঠদ্বয় করিয়াছেন লাল- ইত্যাদি।

এই সকল বিষয়ের প্রতি নজর করিলে স্পষ্টতই প্রতীয়মান হইবে যে,

মানবদেহে তিনি প্রয়োজনীয় অঙ্গের পাশাপাশি এমন কিছু বস্তুও সৃষ্টি করিয়াছেন যাহা সৃষ্টি না করিলে মানবদেহ কার্যক্ষম হওয়ার পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হইত না- কেবল সৌন্দর্যের ঘাটতি হইত। কিন্তু আল্লাহ পাক অশেষ অনুগ্রহ করিয়া মানুষকে এইগুলিও দান করিয়াছেন।

এক্ষণে ভাবিবার বিষয় হইল, যেই আল্লাহ দুনিয়াতে মানুষের জন্য জরুরী আসবাবের পাশাপাশি নিছক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্যও অতি সূক্ষ্ম বিষয় দান করিতে কার্পণ্য করেন নাই; তিনি কেমন করিয়া মানুষকে চিরস্থায়ী ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দিতে পারেন? এতদ্ব্যতীত দুনিয়ার নেজাম ও পার্থিব ব্যবস্থাপনার প্রতি গভীরভাবে দৃষ্টি করিলেও দেখা যাইবে যে, এখানে অধিকাংশ মানুষের জন্যই আরাম ও রাহাত এবং সৌভাগ্যশীল হওয়ার যাবতীয় উপকরণ মওজুদ রাখা হইয়াছে। এমনকি পার্থিব জগতে আল্লাহ পাকের নেয়মতের এমন প্রাবল্য যে, কোন মানুষকে যদি এমন নিশ্চয়তাও দেওয়া হয় যে, মৃত্যুর পর তোমার কোন হিসাব-কিতাব কিংবা আজাব ইত্যাদির সম্মুখীন হইতে হইবে না; তবুও সে দুনিয়ার অজস্র নাজ-নেয়মত ত্যাগ করিয়া স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণ করিতে চাহিবে না। অর্থাৎ পৃথিবীতে আল্লাহর নেয়মতের পর্যাপ্ততার কারণেই এমন লোকের সংখ্যা খুব কমই পাওয়া যাইবে যাহারা মৃত্যু কামনা করে। কুত্রাপি যদি কেহ মৃত্যু কামনা করেও তবে উহার সংখ্যা নেহায়েতই অনুল্লেখ্য এবং ইহা সাধারণ ঘটনা নহে। হয়ত কোন দুর্ঘটনা-দুর্বিপাক এবং বিশেষ কোন পরিস্থিতির শিকার হইয়াই কেহ মৃত্যু কামনা করিয়া থাকিবে।

তো দুনিয়াতেই যদি বান্দার প্রতি আল্লাহ পাকের অনুগ্রহের এমন অবস্থা হয় যে, অধিকাংশ মানুষই এখানে খায়ের ও ছালামতী এবং শান্তি ও নিরাপত্তা প্রাপ্ত হইতেছে, তবে ইহাও প্রবলভাবেই আশা করা যায় যে, পরকালেও তিনি বান্দার প্রতি অনুরূপ অনুগ্রহই বর্ষণ করিবেন। কেননা, আল্লাহ পাকের নেজাম ও নীতির কোন পরিবর্তন হয় না। দুনিয়া ও আখেরাতের সেই অভিন্ন প্রতিপালকের নাম গাফূরুর রাহীম ও লাতীফ। দুনিয়াতে যেমন তিনি স্বীয় বান্দাদের প্রতি অনুগ্রহের দৃষ্টি বর্ষণ করেন, পরকালেও তিনি বান্দাদের প্রতি অনুরূপ আচরণই করিবেন। মানুষ যখন এইভাবে আল্লাহ পাকের দয়া, অনুগ্রহ ও রহমতের কথা চিন্তা করিবে, তখন স্বভাবতই রিজার উপকরণসমূহ প্রবল হইবে।

রিজা প্রবল করার দ্বিতীয় উপায় হইল, রিজা সম্পর্কিত কোরআনের আয়াত, হাদীস ও বুজুর্গানেদ্বীনের বাণীসমূহ অধ্যয়ন করা। এতদ্সংক্রান্ত অসংখ্য আয়াতের কয়েকটি নিম্নে উল্লেখ করা হইল-

قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا * اِنَّهٗ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ *

অর্থ ঃ "বলুন, হে আমার বান্দাগণ যাহারা নিজেদের উপর জুলুম করিয়াছ তোমরা আল্লাহর রহমত হইতে নিরাশ হইও না। নিশ্চয় আল্লাহ সমস্ত গোনাহ ক্ষমা করেন, তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।"

সূরা শুরাতে এরশাদ হইয়াছে–

وَ الْمَلٰئِكَةُ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَ يَسْتَغْفِرُوْنَ لِمَنْ فِي الْاَرْضِ

অর্থ ঃ "ফেরেশতাগণ তাহাদের পালনকর্তার প্রশংসাসহ পবিত্রতা বর্ণনা করে এবং পৃথিবীবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে।"

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে– তিনি দুশমনদের জন্য দোজখ তৈরী করিয়াছেন এবং এই বিষয়ে নিজের প্রিয় বান্দাদিগকে সতর্ক করিয়াছেন। যেমন এরশাদ হইয়াছে–

لَهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ مِنَ النَّارِ وَ مِنْ تَحْتِهِمْ ظُلَلٌ * ذٰلِكَ يُخَوِّفُ اللّٰهُ بِهٖ عِبَادَهٗ

অর্থ ঃ তাহাদের জন্য উপর দিক হইতে এবং নীচের দিক হইতে আগুনের মেঘমালা থাকিবে। এই শাস্তি দ্বারা আল্লাহ তাঁহার বান্দাদেরকে সতর্ক করেন। (সূরা যুমার)

সূরা আলে এমরানে এরশাদ হইয়াছে–

وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِىْ اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِيْنَ *

অর্থ ঃ এবং তোমরা সেই আগুন হইতে বাঁচিয়া থাক যাহা কাফেরদের জন্য প্রস্তুত করা হইয়াছে।

সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে সূরা লাইলে এরশাদ হইয়াছে–

فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظّٰى لَا يَصْلٰهَا اِلَّا الْاَشْقَى الَّذِيْ كَذَّبَ وَ تَوَلّٰى *

অর্থ ঃ অতএব, আমি তোমাদিগকে প্রজ্বলিত অগ্নি সম্পর্কে সতর্ক করিয়া দিয়াছি। ইহাতে নিতান্ত হতভাগ্য বক্তিরাই প্রবেশ করিবে, যে মিথ্যারোপ করে ও মুখ ফিরাইয়া লয়।

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

فَاِنَّ رَبَّكَ لَذُوْ مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلٰى ظُلْمِهِمْ

অর্থ ঃ নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা মানুষের জুলুম সত্ত্বেও তাহাদের জন্য ক্ষমাশীল।

এক হাদীসে আছে– রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বদা নিজের উম্মতের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেন। অবশেষে তাঁহার প্রতি উপরোক্ত আয়াত নাজিল হয় এবং বলা হয় যে, এখনো কি আপনি সন্তুষ্ট নহেন? এরশাদ হইল–

وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ رَبُّكَ فَتَرْضٰى

অর্থাৎ– "আপনার পালনকর্তা সত্বরই আপনাকে দান করিবেন, অতঃপর আপনি সন্তুষ্ট হইবেন।"

এই আয়াতের তাফসীরে আঁ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন– যদি আমার উম্মতের এক ব্যক্তিও দোজখে থাকে তবুও আমি সন্তুষ্ট হইব না।

এ দিকে ইমাম মোহাম্মদ বাকের বলেন, তোমরা ইরাকবাসীরা قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ আয়াতটিকে কোরআন শরীফের শ্রেষ্ঠ আয়াত বলিয়া থাক। আর আমরা নবী পরিবারের লোকেরা وَ لَسَوْفَ يُعْطِيْكَ ربك فترضى আয়াতটিকে শ্রেষ্ঠ আশার আয়াত বলিয়া থাকি।

রিজা সম্পর্কিত হাদীসের বাণী

রিজা বা আশার আলো সম্পর্কিত হাদীসের বাণীসমূহ এই–

হযরত আবু মুসা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন– আমার উম্মত রহমত প্রাপ্ত। আখেরাতে তাহাদের উপর আজাব হইবে না। আল্লাহ পাক ভূমিকম্প ও অন্যান্য দুর্যোগ-দুর্বিপাক দ্বারা দুনিয়াতেই তাহাদিগকে শাস্তি দিয়া দেন। কেয়ামতের দিন আমার উম্মতের প্রত্যেক ব্যক্তিকে আহলে কিতাবের মধ্য হইতে একজনকে দেওয়া হইবে এবং বলা হইবে, এই ব্যক্তি তোমার দোজখের আগুনের 'ফিদয়া' (বিনিময়)। অন্য রেওয়ায়েতে আছে– এই উম্মতের প্রত্যেকে ইহুদী ও নাসারাকে আনিয়া বলিবে, আমার দোজখের আগুনের বিনিময় এই ব্যক্তি। এই কথা বলিয়া তাহাকে দোজখে নিক্ষেপ করিবে।

পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

الحمى من نبح جهنم و هي حظ المؤمن من النار

অর্থাৎ– "জ্বর জাহান্নামের উত্তাপের কিছু অংশ। ইহা দোজখের বরাবরে মোমেনের অংশ।"

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

يَوْمَ لَا يُخْزِ اللّٰهُ النَّبِيَّ وَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ *

অর্থাৎ– "সেই দিন আল্লাহ নবী ও তাঁহার বিশ্বাসী সহচরদিগকে অপদস্থ করিবেন না।"

এই আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক স্বীয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ওহী প্রেরণ করেন, আমি আপনার হাতেই এই উম্মতের হিসাব সোপর্দ করিতেছি। জবাবে রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, এলাহী! আপনি এইরূপ করিবেন না। আমি অপেক্ষা আপনিই তাহাদের জন্য উত্তম। এরশাদ হইল– আমি তাহাদের ব্যাপারে আপনাকে অপদস্থ করিব না।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে আরজি পেশ করিলেন, আমার উম্মতের গোনাহের হিসাবের ভার আমার হাতেই সোপর্দ করুন যেন তাহাদের গোনাহের কথা আমি ব্যতীত অপর কেহ জানিতে না পারে। জবাবে বলা হইল– তাহারা তো কেবল আপনার উম্মত; কিন্তু তাহারা আমার বান্দা। আমি তাহাদের উপর আপনার তুলনায় অধিক মেহেরবান। সুতরাং তাহাদের হিসাব আমি কাহারো হাতে সোপর্দ করিব না, যেন তাহাদের গোনাহ সম্পর্কে আপনিও অবগত হইতে না পারেন এবং অন্য কেহও জানিতে না পারে। সোবহানাল্লাহ! আল্লাহ পাক বান্দার উপর কত মেহেরবান। (দুইটি কবিতা, যাহার ভাবার্থ এই–)

অর্থাৎ– আমাদের মহান বাদশাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের উপর অনুগ্রহশীল এবং তদীয় রাসূলও আমাদের উপর মেহেরবান। সুতরাং পারলৌকিক বিনিময় বিষয়ে আমাদের কোন দুঃশ্চিন্তার কারণ নাই। আমাদের সুলতান মহান আল্লাহ যেমন দয়াবান, অনুরূপ তাঁহার নবীও মেহেরবান।

পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেনঃ আমার জীবন ও মৃত্যু উভয়ই তোমাদের জন্য কল্যাণকর। জীবদ্দশায় আমি তোমাদের নিকট শরীয়তের তরীকা উপস্থাপন করিব। আমার মৃত্যুর পর তোমাদের আমলনামা আমার সম্মুখে পেশ করা হইবে। তখন তোমাদের নেক আমলসমূহের জন্য আমি আল্লাহর শোকর আদায় করিব, আর তোমাদের আমল

মন্দ হইলে আমি উহার জন্য আল্লাহর দরবারে ক্ষমা প্রার্থনা করিব।

হাদীসে পাকে বর্ণিত আছে– বান্দা যখন কোন গোনাহ করার পর আল্লাহ পাকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, তখন আল্লাহ ফেরেশতাগণকে ডাকিয়া বলেন, দেখ, আমার বান্দা গোনাহ করিবার পর আবার ভাবিতেছে যে, তাহার একজন সৃষ্টিকর্তা আছেন, যিনি গোনাহ ক্ষমা করিয়া দেন আবার আজাবও দেন। তোমরা সাক্ষী থাকিও, আমি আমার বান্দাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। হাদীসে কুদসীতে আছে– বান্দা যদি এত অধিক পরিমাণও গোনাহ করে যে, উহার উচ্চতা আসমান পর্যন্ত পৌঁছিয়া যায়, তবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে আমার নিকট ক্ষমা চাহিবে এবং আমার নিকট আশা রাখিবে, আমি তাহাকে ক্ষমা করিয়া দিব। অপর এক হাদীসে আছে– বান্দা যদি গোটা ভূপৃষ্ঠ পরিমাণ গোনাহ লইয়া আমার নিকট আসে, তবে আমিও সেই পরিমাণ মাগফেরাত লইয়াই তাহার নিকট ধরা দিব।

হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে– মানুষ গোনাহ করিবার পর ছয় মুহূর্ত পর্যন্ত ফেরেশতা উহা বান্দার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হইতে বিরত থাকে। এই সময়ের মধ্যে যদি বান্দা তওবা করিয়া ফেলে তবে বান্দার গোনাহ লিপিবদ্ধ করা হয় না। অন্যথায় তাহার আমলনামায় মাত্র একটি গোনাহ লেখা হয়।

অন্য রেওয়ায়েতে আছে– বান্দার একটি গোনাহ লেখার পর সে যদি কোন নেক আমল করে, তবে ডান দিকের ফেরেশতা বাম দিকের ফেরেশতাকে বলে, তুমি এইমাত্র যেই গোনাহটি লিপিবদ্ধ করিলে উহা মুছিয়া ফেল; উহার পরিবর্তে আমিও আমার এখান হইতে তাহার একটি নেকী সরাইয়া ফেলিব। অর্থাৎ, বান্দা এইমাত্র যেই নেক আমলটি সম্পাদন করিল, আমি উহার বিনিময়ে দশটি নেকীর পরিবর্তে নয়টি নেকী লিখিব। মোটকথা, এইভাবেই বান্দার গোনাহ সমূহ দূর করিয়া দেওয়া হয়।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, বান্দা গোনাহ করিলে উহা তাহার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। এক বেদুঈন জিজ্ঞাসা করিল, সে যদি তওবা করে? এরশাদ হইলঃ তবে উহা মিটাইয়া ফেলা হয়। লোকটি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিল, যদি সে আবার গোনাহ করে? আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, তবে উহা তাহার আমলনামায় লিপিবদ্ধ করা হয়। বেদুঈন আবারো জিজ্ঞাসা করিল, যদি সে এইবারও তওবা করে? আল্লাহর নবী ফরমাইলেন, পুনরায় তাহার আমলনামা হইতে উহা মুছিয়া ফেলা হয়। বেদুঈন

আরজ করিল, এইরূপ কতক্ষণ চলিবে? এরশাদ হইলঃ বান্দা যতক্ষণ তওবা করিতে থাকিবে (ততক্ষণই এই ক্ষমা চলিতে থাকিবে)। আল্লাহ্ পাক ক্ষমা করিতে ভয় পান না। বান্দা যতক্ষণ ক্ষমা প্রার্থনায় ক্লান্ত না হইবে, আল্লাহ পাকও ততক্ষণ ক্ষমা করিতে থাকিবেন।

বান্দা যখন কোন নেক আমল করার ইচ্ছা করে অর্থাৎ নেক আমল করার কেবল ইচ্ছা করা হইয়াছে, এখনো উহা কার্যকর করা হয় নাই; এই সময়ই ডান দিকের ফেরেশতা একটি নেকী লিখিয়া ফেলে। আর বান্দা নেক আমলের ইচ্ছা করার পর যদি উহা বাস্তবায়নও করে, তবে ফেরেশতা তাহার নামে দশটি নেকী লিপিবদ্ধ করে। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা ঐ নেকীকে সাতশত গুণ বৃদ্ধি করিয়া দেন। পক্ষান্তরে বান্দা যখন কোন গোনাহ বা মন্দ কাজ করার ইচ্ছা করে তখন উহা বাস্তবায়ন না করা পর্যন্ত তাহার নামে কিছুই লেখা হয় না। বরং উহা বাস্তবায়ন করার পরই তাহার নামে কেবল একটি গোনাহ লেখা হয়। অতঃপর আল্লাহ পাক গাফূরুর রাহীম কোন উছিলায় উহা ক্ষমা করিয়াও দিতে পারেন।

এক ব্যক্তি আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া বলিতে লাগিল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এক মাসের বেশী রোজা রাখি না এবং পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের অতিরিক্ত নামাজ পড়ি না। আমার সম্পদে সদকা, হজ্ব, জাকাত ইত্যাদি কিছুই ফরজ নহে। এমতাবস্থায় মৃত্যুর পর আমি কোথায় থাকিব। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, জান্নাতে। লোকটি পুনরায় আরজ করিল, আপনার সঙ্গে? তিনি মৃদু হাস্য করিয়া ফরমাইলেন, হ্যাঁ, আমার সঙ্গে। তবে শর্ত হইল, তোমার অন্তরকে হিংসা ও বিদ্বেষ এই দুইটি বিষয় হইতে রক্ষা করিয়া চলিতে হইবে। জিহবাকেও দুইটি বিষয় হইতে হেফাজত করিবে। অর্থাৎ, কাহারো গীবত করিবে না এবং মিথ্যা কথা বলিবে না। অনুরূপভাবে তোমার চক্ষুকেও দুইটি কাজ হইতে বিরত রাখিতে হইবে। আল্লাহ পাক যাহা হারাম করিয়াছেন তাহা দেখিবে না এবং কোন মুসলমানকে হেকারত ও হেয় দৃষ্টিতে দেখিবে না। যদি এই সকল বিষয় রক্ষা করিয়া চলিতে পার তবে আমার সঙ্গে এক সাথে বরং আমার দুই হাতের তালুতে তুমি বেহেশতে যাইবে।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, জনৈক বেদুঈন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করিল, মানুষের হিসাবের জিম্মাদার কে হইবেন? জবাবে তিনি ফরমাইলেন, আল্লাহ্ জাল্লা শানুহু মানুষের হিসাবের জিম্মাদার হইবেন। বেদুঈন পুনরায় আরজ করিল, আল্লাহ স্বয়ং হিসাব গ্রহণ

করিবেন? তিনি বলিলেন, হাঁ। লোকটি এইবার মুচকি হাসিল। আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি হাসিলে কেন? সে জবাব দিল, আমি এই কারণে খুশী হইয়াছি যে, করুণাময় যখন কোন সুযোগ পান তখন তিনি ক্ষমা করিয়া দেন, আর যখন হিসাব গ্রহণ করেন, তখন উহা এড়াইয়া যান। নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইলেন, বেদুঈন সত্য বলিয়াছ। জানিয়া রাখ, কোন দয়াবানই আল্লাহ পাক হইতে অধিক দয়াবান নহে এবং তিনিই সর্বাধিক দয়াবান।

উপরোক্ত হাদীসে ইহাও বর্ণিত আছে যে, আল্লাহ পাক কাবাকে আজমত ও মাহাত্ম্য দান করিয়াছেন। যদি কেহ কাবার এক একটি পাথর খসাইয়া চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া ফেলে, তবে উহার কারণে তাহার এই পরিমাণ গোনাহ হইবে না, যাহা একজন আল্লাহর ওলীকে হেয় করার কারণে হইবে। বেদুঈন আরজ করিল, আল্লাহর ওলী কাহারা? এরশাদ হইলঃ সকল ঈমানদারই আল্লাহর ওলী। তুমি কি আল্লাহর এই বাণী শোন নাই–

اِنَّ اللّٰهَ وَلِيُّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا يُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّوْرِ *

অর্থাৎ– যাহারা ঈমান আনিয়াছে আল্লাহ তাহাদের অভিভাবক (ওলী)। তাহাদিগকে তিনি বাহির করিয়া আনেন অন্ধকার হইতে আলোর দিকে।

এক হাদীসে বর্ণিত আছে, المؤمن افضل من الكعبة "মোমেন কাবা হইতে উত্তম।" অন্য এক হাদীসে আছে– আল্লাহ পাক স্বীয় রহমতের অংশবিশেষ দ্বারা দোজখকে একটি বেত্র বানাইয়াছেন এবং উহা দ্বারা তিনি বান্দাকে হাঁকাইয়া জান্নাতের দিকে লইয়া যান।

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হইতে বর্ণিত এক হাদীসে আছে– আল্লাহ পাক এমন কোন বস্তু তৈরী করেন নাই, যাহা অপেক্ষা অপর কোন বস্তুকে বড় বানান নাই। সেমতে স্বীয় রহমতকে তিনি গজবের উপর প্রবল করিয়াছেন। একটি প্রসিদ্ধ হাদীসে আছে– আল্লাহ পাক মানব সৃষ্টির পূর্বে নিজের উপর এই বাক্যটি লিখিয়া লইয়াছিলেন– ان رحمتى تغلب غضبي – আমার গজবের উপর আমার রহমত প্রবল।

হযরত মোয়াজ বিন জাবাল এবং আনাস বিন মালেক (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

من قال لا اله الله دخل الجنة

অর্থাৎ– যেই ব্যক্তি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠ করিল, সে জান্নাতে প্রবেশ

করিল।

আরো এরশাদ হইয়াছে–

من كان اخر كلامه لا اله الا الله لم تمسه النار و من القى الله لا شريك به شيئا حرمه عليه النار *

অর্থাৎ– যেই ব্যক্তির শেষ বাক্য হইবে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" দোজখের আগুন তাহাকে স্পর্শ করিবে না এবং যেই ব্যক্তি এমন অবস্থায় আল্লাহর সঙ্গে মিলিত হইবে যে, আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছু শরীক করে নাই, তাহার উপর দোজখের আগুন হারাম হইবে।

একবার রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করিলেন–

اِنَّ زَلْزَلَةَ السَّاعَةِ شَيْءٌ عَظِيْمٌ *

অর্থাৎ, বে-শক কেয়ামতের ভূ-কম্পন একটি বিরাট ঘটনা।

অতঃপর তিনি উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কি বলিতে পার, ইহা কোন দিবসের কথা? ইহা সেই দিবস, যেই দিবসে আদম (আঃ)-কে বলা হইবে– দাঁড়াও এবং আপন সন্তানদের মধ্য হইতে দোজখের রসদ বাহির করিয়া আন। তিনি আরজ করিবেন, কি পরিমাণ বাহির করিয়া আনিব? হুকুম হইবে– হাজারের মধ্যে একজন জান্নাতের জন্য রাখিয়া অবশিষ্ট নয়শত নিরানব্বই জনকে দোজখের জন্য বাহির করিয়া আন। আল্লাহর রাসূলের মুখে এই কথা শুনিয়া উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম পেরেশান হইয়া কান্নাকাটি শুরু করিয়া দিলেন এবং সেই দিন তাহারা স্বস্থির সহিত কোন কাজই করিতে পারিলেন না। ছাহাবায়ে কেরামের এই পেরেশান হাল দেখিয়া রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা (স্বাভাবিকভাবে) কাজকর্ম করিতেছ না কেন? তাহারা আরজ করিলেন, আপনার নিকট হইতে ঐ হাদীস শোনার পরই আমরা কাজকর্মে শক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছি। আল্লাহর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, তোমরা কি বলিতে পার, অন্যান্য কওমের তুলনায় তোমাদের সংখ্যা কত? অতঃপর তিনি ইয়াজুজ মাজুজসহ আরো কয়েকটি কওমের নাম উল্লেখ করিয়া বলিলেন, কওমের সংখ্যা এত বিপুল যে, উহার সঠিক সংখ্যা আল্লাহ ব্যতীত অপর কাহারো জানা নাই। সেই তুলনায় তোমাদের সংখ্যা এমনই নগন্য যে, উহার কোন গণনাই হইতে

পারে না। উহার উপমা যেমন– কোন কৃষ্ণবর্ণ গরুর গায়ে একটি সাদা পশম কিংবা ঘোড়ার হাঁটুতে অন্য বর্ণের একটি চিহ্ন।

উপরোক্ত হাদীস দ্বারা জানা গেল যে, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবায়ে কেরামকে খওফের চাবুক দ্বারা কেমন করিয়া হাঁকাইতেন এবং কেমন করিয়াই বা রিজার লাগাম দ্বারা আল্লাহর দিকে টানিয়া আনিতেন অর্থাৎ প্রথমে তিনি খওফ ও ভয়ের চাবুক দ্বারা হাঁকাইয়াছেন। কিন্তু যখনই তিনি দেখিতে পাইলেন যে, ভয়ের আতিশয্য তাহাদিগকে সীমার বাহিরে লইয়া গিয়াছে এবং তাহারা নৈরাশ্যের গহবরে পতিত হইতেছে, তখনই তিনি রিজা ও আশার দাওয়াই দ্বারা তাহাদের চিকিৎসা করিয়াছেন। অর্থাৎ, ছাহাবায়ে কেরামকে তিনি খওফ ও রিজার দাওয়াই দ্বারা ভারসাম্যপূর্ণ এক সুসম পথে চালিত করিয়াছেন।

এখানে বর্ণিত হাদীসের প্রথম অংশটি দ্বিতীয় অংশের বিপরীত– এমন সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই। কারণ, ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বিরাজমান অবস্থায় তাহাদের জন্য তিনি যেই পরিমাণ খওফ প্রদর্শন মোনাসেব মনে করিয়াছেন সেই পরিমাণই বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু পরবর্তী অবস্থায় তিনি যখন দেখিলেন, এখন রিজার ঔষধ প্রয়োগ আবশ্যক; তখন উহাই প্রয়োগ করিলেন। সুতরাং ওয়ায়েজদের পক্ষেও সাধারণ মানুষের মধ্যে ওয়াজ করিবার সময় এই মূলনীতির অনুসরণ আবশ্যক। অর্থাৎ মানুষের বাতেনী অবস্থা যখন যেইরূপ হইবে সেই অনুযায়ী খওফ ও রিজার ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। ওয়ায়েজগণ যদি এই ক্ষেত্রে সঠিকভাবে রোগ নির্ণয়পূর্বক যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে ব্যর্থ হন, তবে হিতে বিপরীত ফল ফলিবার আশংকাই বেশী। অর্থাৎ, ওয়াজের বিষয়বস্তু নির্বাচনের ক্ষেত্রে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে না পারিলে ঐ ওয়াজ দ্বারা মানুষের এছলাহের পরিবর্তে ক্ষতিই হইবে বেশী।

এক হাদীসে আছে– তোমরা যদি গোনাহ না কর, তবে আল্লাহ পাক এমন মানুষ সৃষ্টি করিবেন যাহারা গোনাহ করিয়া আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবে এবং আল্লাহ পাক তাহাদের গোনাহ ক্ষমা করিয়া দিবেন। কেননা, আল্লাহ পাকের জাত ক্ষমাশীল এবং তিনি দয়ালু। অপর এক হাদীসে আছে, তোমরা যদি গোনাহ না কর তবে আমি তোমাদের ব্যাপারে এমন এক বিষয়ের আশংকা করিতেছি যাহা গোনাহ অ. ক্ষা আরো ভয়াবহ। ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, উহা কি? এরশাদ হইলঃ অহমিকা। অন্য হাদীসে আছে– ঐ জাতের কসম! যাহার আয়ত্বে মোহাম্মদের প্রাণ, আল্লাহ পাক কেয়ামতের দিন এমন ক্ষমা প্রদর্শন করিবেন যে, মানুষ কখনো উহা কল্পনাও করিতে পারে নাই।

এমনকি ইবলিশও সেই দিন এমন আশা পোষণ করিবে যে, আজ হয়ত তাকেও ক্ষমা করিয়া দেওয়া হইবে।

মাত্র একটি রহমতের কারণে

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ্ পাক নিজের একশত রহমতের মধ্যে নিরানব্বইটি নিজের নিকট রাখিয়া কেবল একটি মাত্র রহমত দুনিয়াতে প্রকাশ করিয়াছেন। এই একটিমাত্র রহমতের কারণেই গোটা সৃষ্টিকুল একে অপরের প্রতি অনুগ্রহ ও দয়া-মায়া পোষণ করে। জননী স্বীয় সন্তানকে ভালবাসে এবং জীবজন্তু তাহাদের সাবকদের প্রতি মমতা পোষণ করে। রোজ কেয়ামতে আল্লাহ্ পাক ঐ এক রহমতকে নিরানব্বই রহমতের সঙ্গে যোগ করিয়া গোটা সৃষ্টির মধ্যে ছড়াইয়া দিবেন। উহার একটি মাত্র রহমত হইবে গোটা আসমান ও জমিনের বরাবর। আল্লাহর নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমাদের মধ্যে এমন কেহ নাই, যাহার আমল তাহাকে জান্নাতে পৌঁছাইয়া দিবে কিংবা দোজখ হইতে রক্ষা করিবে (অর্থাৎ, সেই দিন আল্লাহর রহমত ছাড়া কাহারো কোন উপায় থাকিবে না)। উপস্থিত ছাহাবায়ে কেরাম আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সেই দিন কি আপনার অবস্থাও অনুরূপ হইবে? এরশাদ হইলঃ আমার অবস্থাও অনুরূপ হইবে; যেই পর্যন্ত না আল্লাহর রহমত আমাকে আবৃত করিয়া লইবে। প্রিয় নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফরমাইয়াছেন, আমার গোনাহগার উম্মতের জন্য আমার শাফায়াত গোপন রাখিয়াছি। আমার শাফায়াত কেবল নেককার লোকদের জন্যই নহে; বরং গোনাহগারদের জন্যও।

রিজা সম্পর্কে মহাজনদের উক্তি ও বিবিধ ঘটনা

ইতিপূর্বে হাদীসের আলোকে রিজা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে আমরা এই বিষয়ে মনীষীবর্গের বিবিধ ঘটনা ও মহাজনদের উক্তি আলোচনা করিব–

হযরত আলী (রাঃ) বলেন, কোন গোনাহগারের অপরাধ যখন আল্লাহ দুনিয়াতে গোপন রাখেন, তখন তাঁহার অনুগ্রহ ও কৃপা ইহা চাহে না যে, পরকালে ঐ অপরাধের পর্দা খুলিয়া দেওয়া হইবে। আর কোন গোনাহগারের অপরাধের শাস্তি যদি দুনিয়াতেই দিয়া দেওয়া হয়, তবে আল্লাহ্ পাকের আদল ও ইনসাফের দাবী ইহা নহে যে, বান্দা পুনর্বার আখেরাতে সেই শাস্তি ভোগ করুক।

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেন, আমার আমলের হিসাব যদি আমার (পরম হিতাকাঙ্ক্ষী) মাতাপিতার হাতে সোপর্দ করা হয়, তবে এই ব্যবস্থাকেও আমি নিজের জন্য সহজ মনে করিব না। কেননা, আমার স্থির বিশ্বাস যে, আল্লাহ্ পাক আমার মাতাপিতা অপেক্ষা আমার উপর অধিক মেহেরবান। কোন কোন বুজুর্গ বলেন, মোমেন বান্দা যখন আল্লাহর নাফরমানী করে তখন আল্লাহ পাক মোমেনের সেই নাফরমানী ফেরেশতাদের নজর হইতে গোপন করিয়া রাখেন যেন ফেরেশতাগণ উহার সাক্ষী হইয়া না থাকে।

হযরত মোহাম্মদ বিন মুসয়িব আসওয়াদ বিন সালেমকে স্বহস্তে লিখেন– কোন বান্দা যখন নিজের উপর জুলুম করিবার পর "ইয়া রব" বলিয়া আল্লাহর দরবারে হাত উঠায়, তখন ফেরেশতাগণ তাহার আওয়াজকে ফিরাইয়া রাখে। দ্বিতীয় ও তৃতীয়বারও এইরূপ করা হয়। কিন্তু চতুর্থবারও যখন বান্দা এইভাবে "ইয়া রব" বলিয়া আল্লাহকে ডাকে, তখন আল্লাহ ফেরেশতাগণকে ডাকিয়া বলেন, আমার বান্দার ডাক আর কতক্ষণ আমার নিকট হইতে গোপন রাখিবে? আমার বান্দা ইহা জানিয়া গিয়াছে যে, আমি ব্যতীত তাহার এমন আর কোন মনিব নাই, যে তাহার গোনাহ ক্ষমা করিবে। হে ফেরেশতাগণ! তোমরা সাক্ষী থাকিও, আমি আমার বান্দার গোনাহ ক্ষমা করিয়া দিলাম।

প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত ইবরাহীম বিন আদহাম বলেন, এক রাতে আমার একাকী কাবা ঘর তাওয়াফ করার সুযোগ হইয়াছিল। রাতটি ছিল গভীর অন্ধকার। আমি কাবার মুলতাযিমের নিকট দাঁড়াইয়া অতীব বিনয়ের সহিত আল্লাহর দরবারে আরজ করিলাম, আয় মাওলায়ে কারীম! তুমি আমাকে যাবতীয় গোনাহ হইতে হেফাজতে রাখিও, যেন কখনো আমার দ্বারা কোন অপরাধ না হয়। সঙ্গে সঙ্গে কাবার অভ্যন্তর হইতে গায়েবী আওয়াজ আসিল, হে ইবরাহীম! তুমি আমার নিকট নিষ্পাপ থাকার প্রার্থনা করিতেছ এবং সকল ঈমানদারই এই প্রার্থনা করে। আমি যদি সকলকে নিষ্পাপ করিয়া দেই, তবে আর কাহার উপর আমার অনুগ্রহ ও ক্ষমা বর্ষণ করিব? হযরত নেজামী গান্‌জুমী যথার্থ বলিয়াছেন– (যাহার ভাবর্থ এই–)

অর্থাৎ– আমরা যদি অপরাধ না করি, আর আমাদের অপরাধ যদি গোনাহের মধ্যে গণ্য করা না হয়; তবে কেমন করিয়া তোমার নাম 'ক্ষমাকারী' হইবে?

হযরত রুবায়ী বিন খারাশ স্বীয় পিতার ঘটনা বর্ণনা করিয়া বলেন, আমার পিতার ইন্তেকালের পর যখন তাহাকে কাফন পরানো হইল, তখন তিনি নিজের

চেহারা হইতে কাফন সরাইয়া সোজা হইয়া বসিয়া বলিতে লাগিলেন, আমি আমার রবের সঙ্গে মিলিত হইয়াছি এবং তিনি শান্তি ও রুজি দ্বারা আমার সমাদর করিয়াছেন। আল্লাহ পাক আমার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন না এবং এই বিষয়ে আমি যেইরূপ ধারণা করিয়াছিলাম উহা হইতে অনেক আছান পাইয়াছি। সুতরাং হে বৎসগণ! দুনিয়াতে তোমরা অলসতা করিও না।

পাপীকে ঘৃণা করায়

হাদীসে এয়ামনে বর্ণিত আছে– বনী ইসরাঈলের দুই ব্যক্তির মধ্যে বেশ বন্ধুত্ব ছিল, তাহারা আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে একে অপরকে মোহাব্বত করিত। তাহাদের একজন ছিল গোনাহগার এবং অপরজন ছিল আবেদ। আবেদ বন্ধুটি সকল সময় তাহার গোনাহগার বন্ধুকে সুপথে ফিরিয়া আসার তাকীদ দিয়া তিরস্কার করিত। আর সেও জবাব দিত, আমার বিষয় আমি বুঝিব আর বুঝিবেন আমার আল্লাহ। আমার উপর তোমাকে নেগরান বানানো হয় নাই।

এক দিন সেই আবেদ তাহার সেই গোনাহগার বন্ধুকে কোন কবীরা গোনাহের কাজ করিতে দেখিয়া ক্রোধের সহিত বলিল, আল্লাহ পাক তোমাকে ক্ষমা করিবেন না।

কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক সেই গোনাহগার বান্দাকে বলিবেন, আমার কোন পাপী বান্দার উপর যদি আমি রহম করি, তবে কেহ কি আমাকে উহা হইতে ফিরাইয়া রাখিতে পারিবে? যাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। আর সেই আবেদকে বলিবেন, দোজখের কঠিন শাস্তি আমি তোমার জন্য অপরিহার্য করিয়া দিলাম। অতঃপর রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করেন, ঐ আবেদ এমন কথা বলিয়াছে, যাহা দ্বারা তাহার দ্বীন ও দুনিয়া উভয়ই বরবাদ হইয়া গিয়াছে।

আবেদকে ইজ্জত করায়

কথিত আছে যে, বনী ইসরাঈলের এক ব্যক্তি ক্রমাগত চল্লিশ বৎসর চুরি ও রাহাজানী করিয়া কাটাইয়া দিবার পর একদিন সে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সাক্ষাত পাইল। হযরত ঈসা (আঃ) তখন তাঁহার একজন আবেদ সহচরসহ কোথায় যাইতেছিলেন। চোর মনে মনে ভাবিল, আল্লাহর নবী আমার সম্মুখ দিয়া যাইতেছেন, তাঁহার পিছনে পিছনে একজন আবেদও যাইতেছে, এক্ষণে আমিও যদি সেই আবেদের সঙ্গী হইতে পারি, তবে নিশ্চয়ই আমিও ভাগ্যবান

হইব। মনে মনে এই কল্পনা করার সঙ্গে সঙ্গে সে ঐ আবেদের দিকে আগাইয়া গেল। কিন্তু হযরত ঈসা (আঃ)-এর অনুগামী সেই আবেদের নিকটবর্তী হওয়ার পরই সে ভাবিল– আমি একজন গোনাহগার বান্দা, আর হযরত ঈসা (আঃ)-এর এই সহচরটি আল্লাহর একজন প্রিয় বান্দা। সুতরাং তাহার সমান সমান হইয়া চলা আমার পক্ষে বেআদবী হইবে। অতঃপর সে আবেদের তাজীম করিয়া তাহার পিছনে পিছনে চলিল।

এদিকে হযরত ঈসা (আঃ)-এর সেই আবেদ সহচর যখন দেখিতে পাইলেন যে, তাহার পিছনে এক চোর আগাইয়া আসিতেছে, তখন তিনি ভাবিলেন, চোর আমার সমান হইয়া এক সঙ্গে হাঁটিলে আমার ইজ্জতের হানি হইবে। সুতরাং তিনি দ্রুত পা চালাইয়া হযরত ঈসা (আঃ)-এর বরাবর হইয়া এক সঙ্গে চলিতে লাগিলেন। আর চোর দূরত্ব বজায় রাখিয়া তাহাদের পিছনে পিছনে আসিতে লাগিল।

বর্ণনাকারী বলেন, এই সময় আল্লাহ পাক ওহী পাঠাইয়া হযরত ঈসা (আঃ)-কে বলিলেন, হে ঈসা! আপনি ঐ দুই ব্যক্তিকে বলিয়া দিন যে, তাহাদের উভয়ের অতীতের সকল আমল বাতিল করিয়া দেওয়া হইয়াছে। এখন যেন তাহারা নূতনভাবে আমল শুরু করে। আপনার আবেদ সহচরের আমল এই কারণে বাতিল করা হইয়াছে যে, সে মনে মনে অহংকার করিয়াছিল। আর ঐ গোনাহগারের অতীতের সমুদয় পাপ এই কারণে মিটাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, সে নিজের অতীতের অপরাধবৃত্তির কথা কল্পনা করিয়া নিজেকে হীন মনে করতঃ আবেদকে ইজ্জত করিয়াছিল।

অতঃপর হযরত ঈসা (আঃ) তাহাদিগকে ঐ সংবাদ জানাইয়া দিয়া সেই চোরকে নিজের সঙ্গে লইয়া লইলেন।

যেমন প্রার্থনা তেমন ফল

দুই আবেদ ব্যক্তি এবাদত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে সমান সমান ছিল। কিন্তু মৃত্যুর পর যখন তাহারা বেহেশতে গেল, তখন তাহাদের একজন অপরজন অপেক্ষা উচ্চ মর্যাদা লাভ করিল। ফলে অপেক্ষাকৃত নিম্ন মর্যাদার আবেদ আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করিল, আয় পরওয়াদিগার! দুনিয়াতে ঐ ব্যক্তি আমার তুলনায় বেশী এবাদত করে নাই; অথচ আজ তুমি তাহাকে উচ্চ মর্যাদা দান করিলে। আল্লাহ পাক এরশাদ করিলেন, দুনিয়াতে থাকাকালে ঐ ব্যক্তি আমার নিকট উচ্চ মর্যাদা লাভ করার দোয়া করিত। আর তুমি কেবল দোজখের আগুন হইতে

মুক্তির দোয়া করিতে। আমি তোমাদের উভয়কে যার যার চাহিদা অনুযায়ী দান করিয়াছি।

ইহা দ্বারা জানা গেল যে, রিজা বা আশার সহিত এবাদত করা চাই এবং সর্বদা বড় আশা পোষণ করা চাই। কারণ, খওফ অপেক্ষা রিজার মাধ্যমেই মনিবের সহিত সম্পর্ক গভীরতর হয়। মনে কর– এক ব্যক্তি মনিবের সেবা করে তাহার শানের ভয়ে এবং আরেক ব্যক্তি সেবা করে মনিবের পক্ষ হইতে প্রতিদান বা পুরস্কার পাওয়ার আশায়। এই ক্ষেত্রে শেষোক্ত ব্যক্তির সঙ্গেই মনিবের সম্পর্ক গভীরতর হইবে। এই কারণেই আল্লাহ পাক তাঁহার প্রতি হুসনে যন বা সুধারণা পোষণ করার হুকুম করিয়াছেন। সেমতে পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, তোমরা আল্লাহর নিকট উচ্চ মর্যাদা প্রার্থনা করিবে। কারণ, তোমরা এমন ছখী ও দাতার নিকট প্রার্থনা করিতেছ, দান করা যাহার পক্ষে কোন কঠিন বিষয় নহে। তিনি আরো এরশাদ করিয়াছেন, আল্লাহ পাকের নিকট খুব আগ্রহের সহিত প্রার্থনা করিবে এবং তাহার নিকট উচ্চতর মোকাম ফিরদাউসের আবেদন করিবে। কেননা, এমন কোন বস্তু নাই যাহা তিনি দান করিতে পারেন না।

হযরত বকর বিন ছালীম ছাওয়াফ (রহঃ) বলেন, হযরত মালেক বিন আনাসের ইন্তেকালের পূর্ব মুহূর্তে আমি তাঁহার নিকট গেলাম। ঐ সময় তিনি জীবনের শেষ মুহূর্তগুলি অতিক্রম করিতেছিলেন। আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, আপনার এখন কেমন অনুভব হইতেছে? তিনি বলিলেন, তোমার প্রশ্নের কি জবাব দিব তাহা আমার জানা নাই। তবে খুব শীঘ্রই তোমরা আল্লাহ পাকের এমন অফুরন্ত ক্ষমা দেখিতে পাইবে, যাহা ইতিপূর্বে তোমরা কখনো কল্পনা করিতে পার নাই। এই মন্তব্যের কিছুক্ষণ পর তিনি আমাদের সম্মুখেই ইন্তেকাল করিলেন।

আবু ছহল যিজাজী ছিলেন প্রখ্যাত বুজুর্গ। মানুষকে আল্লাহ পাকের আজাব ও গজবের কথা বলিয়া ভীতি প্রদর্শনের ব্যাপারে তাহার খুব খ্যাতি ছিল। এই বুজুর্গের ইন্তেকালের পর তাহার উস্তাদ আবু ছহল ছালাউ স্বপ্নযোগে তাহার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে জবাবে তিনি বলিলেন, আপনি আমাকে যেই পরিমাণ ভীতি প্রদর্শন করিতেন আমি উহা অপেক্ষা অনেক সহজ পাইয়াছি।

এদিকে উস্তাদ আবু ছহলের ইন্তেকালের পর স্বপ্নযোগে কেহ তাহাকে এমন উত্তম অবস্থায় দেখিতে পাইল যে, উহা ভাষায় বর্ণনা করিবার মত নহে। তাহাকে জিজ্ঞাসা করা হইল, আপনি কেমন করিয়া এমন উচ্চ মর্যাদা লাভ

করিলেন? জবাবে তিনি বলিলেন, আল্লাহ পাকের প্রতি 'হুসনে যন' বা সুধারণা পোষণ করার কারণে। অর্থাৎ আল্লাহ পাকের প্রতি আমি যেমন ধারণা পোষণ করিয়াছিলাম এখানে তাহাকে তেমনই পাইয়াছি।

আবুল আব্বাস বিন শারীহ অন্তিম পীড়ায় স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন, যেন কেয়ামত কায়েম হইয়াছে এবং আল্লাহ পাক বলিতেছেন, আলেমগণ কোথায়? অতঃপর তাহারা হাজির হইলে আল্লাহ পাক জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা এলেম দ্বারা কি আমল করিয়াছ? আলেমগণ জবাব দিলেন, আয় পরওয়ারদিগার! আমাদের দ্বারা ত্রুটি হইয়াছে এবং আমরা অপরাধ করিয়াছি। মনে হইল যেন এই জবাবটি আল্লাহ পাকের পছন্দ হয় নাই। অতঃপর আল্লাহ পাক ঐ একই প্রশ্ন করিলেন, যেন আলেমদের পক্ষ হইতে অন্য কোন জবাব আসে।

ইবনে শারীহ বলেন, আমি আরজ করিলাম, এলাহী! আমার আমলনামায় কোন শিরক নাই; তুমি তো ওয়াদা করিয়াছ যে, শিরক ব্যতীত অপরাপর গোনাহসমূহ তুমি ক্ষমা করিয়া দিবে। আমার এই কথা শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে হুকুম হইলঃ যাও, আমি সকলকে ক্ষমা করিয়া দিলাম। এই ঘটনার তিন দিন পর এই বুজুর্গ দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।

হযরত মানসুর বিন আম্মার বসরী (রহঃ)-এর চারিটি দোয়া

জনৈক মদ্যপায়ী সর্বদা বন্ধু-বান্ধব লইয়া মদের আসরে পড়িয়া থাকিত। এক দিন সে মদ পানের পূর্বে আহারের জন্য কিছু ফল ক্রয় করিয়া আনিতে নিজের গোলামকে চার দেরহাম দিয়া বাজারে পাঠাইল। গোলাম বাজারে যাওয়ার পথে দেখিতে পাইল, বসরার প্রসিদ্ধ বুজুর্গ হযরত মনসুর বিন আম্মারের নিকট এক ফকীর ভিক্ষা প্রার্থনা করিতেছে। জবাবে তিনি বলিতেছেন, যেই ব্যক্তি এই ফকীরকে চার দেরহাম দান করিবে আমি তাহার জন্য চারিটি দোয়া করিব। গোলাম হযরত মনসুরের এই কথায় প্রভাবিত হইয়া ফকীরকে ঐ চার দেরহাম দান করিয়া দিল। হযরত মনসুর এইবার গোলামকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি দোয়া চাও বল। গোলাম অত্যন্ত বিনয়ের সহিত আরজ করিল–

✯ আমার মনিব যেন আমাকে মুক্ত করিয়া দেন।

★ আমি যেন এই দেরহামগুলির প্রতিদান পাই।

★ আল্লাহ পাক যেন আমাকে এবং আমার মনিবকে তওবা করার তওফীক দান করেন।

★ আল্লাহ পাক যেন আমাকে, আমার মনিবকে, আপনাকে এবং এই কওমকে মাফ করিয়া দেন।

গোলামের উপরোক্ত আরজির প্রেক্ষিতে হযরত মনসুর বিন আম্মার দোয়া করিলেন, যেন গোলামের সমস্ত মকসুদ পূরণ হয়। দোয়া শেষ হওয়ার পর গোলাম খালি হাতে বাড়ী ফিরিয়া গেল। মনিব তাহাকে বিলম্বের কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে পথে ফকীরের ভিক্ষা প্রার্থনা এবং হযরত মনসুরের দোয়া ইত্যাদি সমস্ত ঘটনা খুলিয়া বলিল। মনিব জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি হযরত মনসুরের দ্বারা কি কি দোয়া করাইয়াছ?

জবাবে গোলাম বলিল, আমার প্রথম দোয়া ছিল– আপনি যেন আমাকে আজাদ করিয়া দেন। মনিব সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, আমি এই মুহূর্তে তোমাকে আজাদ করিয়া দিলাম। তোমার দ্বিতীয় দোয়ার কথা বল।

গোলাম কহিল, আমার দ্বিতীয় দোয়া ছিল– আমি যেন ঐ চার দেরহামের প্রতিদান পাই। মনিব বলিলেন, ঐ চার দেরহাম আমার পক্ষ হইতে তোমাকে হাদিয়া। তোমার তৃতীয় দোয়া কি ছিল বল?

গোলাম বলিল, আমার তৃতীয় দোয়া ছিল– আল্লাহ পাক যেন আমাকে এবং আপনাকে তওবা করিবার তাওফীক দান করেন। মনিব সঙ্গে সঙ্গে যাবতীয় পাপ হইতে তওবা করিয়া ফেলিলেন।

সবশেষে গোলাম তাহার চতুর্থ দোয়ার কথা উল্লেখ করিয়া কহিল, আমার চতুর্থ দোয়া ছিল– আল্লাহ পাক যেন আমাকে, আপনাকে এবং ঐ বুজুর্গকে এবং আমাদের গোটা কওমকে ক্ষমা করিয়া দেন। এই কথা শুনিয়া মনিব বলিলেন, ইহা আমার কাজ নহে।

পরবর্তী রাতে মনিব স্বপ্নে দেখিলেন, কে যেন তাহাকে ডাকিয়া বলিতেছে– হে আল্লাহর বান্দা! তুমি যখন তোমার এখতিয়ারভুক্ত তিনটি কাজ সম্পন্ন করিয়াছ, তবে তুমি কি মনে করিতেছ, যাহা আমার এখতিয়ারভুক্ত তাহা আমি পূরণ করিব না? আমি তোমাকে, তোমার গোলামকে, মনসুর বিন আম্মারকে এবং অপরাপর সকলকে ক্ষমা করিয়া দিলাম।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর ঘটনা

একবার এক অগ্নিপূজক হযরত ইবরাহীম আলাইহিস্সালামের মেহমান হইতে চাহিলে তিনি তাহাকে বলিলেন, তুমি যদি ইসলাম গ্রহণ কর, তবে তোমাকে আহার করাইব। কিন্তু লোকটি এই প্রস্তাবে সম্মত না হইয়া তথা হইতে প্রস্থান করিল। সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহ পাক ওহীর মাধ্যমে হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে বলিলেন, হে ইবরাহীম! ইসলাম গ্রহণ করে নাই বলিয়া তুমি ঐ ব্যক্তিকে এক বেলার খাবার দিতে সম্মত হইলে না। অথচ ঐ ব্যক্তি সত্তর বৎসর যাবৎ কুফরী অবস্থায় থাকা সত্ত্বেও আমি তাহার রিজিক দিয়া আসিতেছি।

হযরত ইবরাহীম (আঃ) সঙ্গে সঙ্গে ঐ কাফেরের সন্ধানে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং তাহাকে রাস্তা হইতে ফিরাইয়া আনিয়া আহার করাইলেন। আহার শেষে লোকটি হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, প্রথম বার তো আপনি আমাকে আহার দিতে অস্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু পরে আবার পথ হইতে ডাকিয়া আনিয়া খানা খাওয়াইবার কারণ কি? জবাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ) বিস্তারিত ঘটনা খুলিয়া বলিবার পর সেই অগ্নিপূজক আল্লাহ পাকের রহমতের পরিচয় পাইয়া সঙ্গে সঙ্গে মুসলমান হইয়া গেলেন।

মানুষের হীন দৃষ্টির কারণে

হযরত আব্দুল্লাহ ওয়াহাব বিন আব্দুল মজিদ (রহঃ) বর্ণনা করেন, একবার আমি দেখিতে পাইলাম, তিনজন পুরুষ এবং একজন মহিলা একটি লাশ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে। পরে আমিও সেই লাশ বহনে শরীক হইলাম এবং কবরস্তানে গিয়া লাশের নামাজ ও দাফন সম্পন্ন হওয়ার পর সেই মহিলাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মৃত লোকটি তোমার কি হইত? সে বলিল, আমার ছেলে। আমি পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলাম, তুমি কেন লাশ বহন করিলে, তোমার কোন পুরুষ আত্মীয় বা প্রতিবেশী ছিল না? মহিলা মলিন বদনে জবাব দিল, সবই ছিল বটে, কিন্তু তাহারা আমার ছেলেকে হীন মনে করিত। আমি উহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, আমার ছেলেটি নপুংসক ছিল বিধায় সকলে তাহাকে হেয় দৃষ্টিতে দেখিত এবং এই কারণেই লোকেরা তাহার লাশ বহন করিতেও সম্মত হয় নাই।

বর্ণনাকারী বলেন, মহিলার প্রতি এবং তাহার মৃত ছেলেটির প্রতি মানুষের অসহযোগের বিবরণ শুনিয়া আমার অন্তরে করুণা সৃষ্টি হইল। আমি মহিলাকে আমার বাড়ীতে লইয়া গেলাম এবং তাহাকে কিছু নগদ অর্থ, বস্ত্র ও খাবার দিয়া

বিদায় করিলাম। সেই রাতেই আমি স্বপ্নে দেখিলাম, পূর্ণিমার চাঁদের মত উজ্জ্বল জ্যোতির্ময় এক ব্যক্তি আমার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। তাহার পরিধেয় সাধা ধবধবে লেবাস হইতেও যেন উজ্জ্বল দ্যুতি ছড়াইতেছিল। আর লোকটি পুনঃ পুনঃ আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছিল। আমি তাহার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিল, আমি সেই নপুংসক– আজ তুমি যাহাকে দাফন করিয়া আসিয়াছ। দুনিয়াতে মানুষ আমাকে হীন মনে করিত, এই কারণে মৃত্যুর পর আল্লাহ পাক আমার উপর রহম করিয়াছেন।

হযরত মা'রূফ কারখীর দোয়া

হযরত ইবরাহীম আতরোশ বর্ণনা করেন, আমরা কয়েক ব্যক্তি বাগদাদের দজলা নদীর তীরে হযরত মা'রূফ কারখী (রহঃ)-এর সঙ্গে উপবিষ্ট ছিলাম। এই সময় আমরা দেখিতে পাইলাম, একটি ডিঙ্গি নৌকাতে কয়েকজন যুবক শরাব পান করিতে করিতে ঢোল-তবলা লইয়া নদী বিহারে বাহির হইয়াছে। উপস্থিত সকলে হযরত মা'রূফ (রহঃ)-এর খেদমতে আরজ করিল, আয় শায়েখ! ঐ বিপথগামী যুবকরা কেমন প্রকাশ্যে আল্লাহর নাফরমানী করিতেছে! আপনি তাহাদের জন্য বদদোয়া করুন। হযরত শায়েখ সঙ্গে সঙ্গে আল্লাহর দরবারে হাত উঠাইয়া আরজ করিলেন, আয় মওলায়ে কারীম! ঐ যুবকদিগকে তুমি দুনিয়াতে যেমন আনন্দে রাখিয়াছ, অনুরূপ আখেরাতেও তাহাদিগকে আরামে রাখিও। উপস্থিত সকলে হযরত শায়েখের এই দোয়ায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া বলিল, আয় শায়েখ! যাহারা প্রকাশ্যে আল্লাহর নাফরমানী করিতেছে, আপনি তাহাদের জন্য পরকালের নাজাত কামনা করিতেছেন? জবাবে হযরত শায়েখ বলিলেন, আল্লাহ পাক যদি পরকালে তাহাদিগকে মুক্তি দেন, তবে দুনিয়াতেও অবশ্যই তাহাদিগকে তওবা নসীব করিবেন। অর্থাৎ, আমার এই দোয়ার অর্থ হইল– আল্লাহ পাকের যেন তাহাদিগকে তওবা করিয়া সুপথে ফিরিয়া আসার তওফীক দান করেন।

উপরে রিজা এবং উহার উপকরণ বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা করা হইল। এই সকল বিষয় দ্বারা ভীত ও নিরাশ ব্যক্তিদের অন্তরে রিজা সজীব ও প্রাণবন্ত হইয়া উঠে। কিন্তু যাহাদের অন্তর অহংকার ও তাকাব্বুরীতে পরিপূর্ণ এবং যাহারা নির্বোধ তাহাদিগকে কখনো রিজার কথা শোনাইতে নাই। তাহাদের এছলাহ ও সংশোধনের উপযুক্ত দাওয়াই হইল খওফ বা ভয়। যেমন উশৃংখল ও দুষ্ট বালকগণ কঠোর শাসন ছাড়া কখনো সোজা হয় না।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

খওফ

ভবিষ্যতের কোন মন্দ বিষয়ের আশংকায় সৃষ্ট মানব মনের দুর্ভাবনা ও দুশ্চিন্তাকে বলা হয় খওফ। রিজা অধ্যায়ের দীর্ঘ আলোচনা দ্বারাও এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া গিয়াছে। আল্লাহ পাকের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার পর বান্দা যখন খোদায়ী নূর বা আল্লাহর সৌন্দর্য অবলোকন করিতে থাকে, তখন আর ভবিষ্যতের প্রতি তাহার মনোযোগ নিবদ্ধ হয় না। এই পর্যায়ে বান্দা খওফ ও রিজা তথা ভয় ও আশা ইত্যাদি কোন কিছু দ্বারাই প্রভাবিত হয় না; বরং বান্দা তখন এই সকল বিষয়ের উর্ধ্বে অবস্থান করে। কারণ, খওফ ও রিজা হইতেছে এমন দুইটি লাগাম যাহা বান্দাকে অবাধ্যতার সীমায় যাইতে দেয় না। এই প্রসঙ্গে হযরত ওয়াসেতী (রঃ) বলেন– খওফ হইল আল্লাহ ও বান্দার মাঝে একটি পর্দা। তিনি আরো বলিয়াছেন– মানুষের অন্তরে যখন হক ও সত্যের বিকাশ প্রবল হইয়া দেখা দেয়, তখন আর উহাতে খওফ ও রিজার কোন অবকাশ থাকে না। সারকথা হইল, প্রেমাস্পদকে অবলোকন করার সময় প্রেমিকের অন্তরে যদি বিরহের ভয়ও বিরাজ করে, তবে এই অবলোকন হইবে ত্রুটিপূর্ণ এবং এই প্রেমকে স্বার্থক বলা যাইবে না। বরং কোন প্রকার হেজাব ও বাধা-বিঘ্নহীন নিরবচ্ছিন্ন অবলোকনই হইল প্রেমের চূড়ান্ত মোকাম। কিন্তু আমরা এখানে প্রাথমিক মোকামের আলোচনা করিব– যাহাতে খওফ ও ভয়েরও মিশ্রণ থাকিবে।

এলেম, হাল ও আমল; মানব হৃদয়ে এই তিনটি বিষয়ের সমন্বয়ে অস্তিত্ব লাভ করে খওফ। এখানে আলোচিত 'এলেম' এর অর্থ হইল, এমন বিষয়ে জ্ঞান যাহা মানুষের অন্তরে অনিষ্টের আশংকা পয়দা করিয়া দেয়। উদাহরণ স্বরূপঃ কোন ব্যক্তি রাজ-অপরাধ করিয়া বাদশাহর হাতে বন্দী হওয়ার পর সে অবশ্যই কতল হওয়ার খওফ করিবে। এই ক্ষেত্রে ক্ষমা পাওয়া কিংবা পালাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা থাকিলেও তাহার অন্তরে সেই পরিমাণ খওফ সৃষ্টি হইবে– কতলের

কারণ সম্পর্কে তাহার যেই পরিমাণ এলেম থাকিবে। সে যদি জানিতে পারে যে, তাহার অপরাধ খুবই গুরুতর কিংবা বাদশাহ স্বভাবে ক্রুদ্ধ ও প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং তাহার নিজের নিকটও মুক্তির কোন উপায় নাই, তাহার পক্ষে এমন কোন সুপারিসকারীও নাই যাহার আবেদনক্রমে তাহার শাস্তি মওকুফ কিংবা বাদশাহর ক্রোধ দমন হইতে পারে। অর্থাৎ এই সময় তাহার অন্তরে সৃষ্ট খওফ ও ভয় নিবারণ হওয়ার কোন উপকরণই যদি তাহার নিকট মওজুদ না থাকে, তবে এমতাবস্থায় নিঃসন্দেহে তাহার খওফ অধিকতর জোরদার ও বদ্ধমূল হইবে। পক্ষান্তরে অন্তরে ভয় সৃষ্টি হওয়ার কারণসমূহ যদি দুর্বল হয় তবে তাহার খওফও সেই পরিমাণ দুর্বল হইবে।

অনেক সময় অপরাধ ছাড়াও অন্তরে খওফ সৃষ্টি হইয়া থাকে। যেমন কোন হিংস্র প্রাণীর মুখোমুখী হওয়ার পর নিজের মধ্যে কোন অপরাধ না থাকিলেও অন্তরে খওফ পয়দা হয়। এখানে খওফ ও ভয়ের কারণ হইল প্রতিপক্ষের স্বভাব সম্পর্কে এলেম। আমরা জানি, বাঘ-সিংহ ইত্যাদি হিংস্রপ্রাণী সুযোগ পাইলেই মানুষের উপর আক্রমণ করে। এখানে প্রতিপক্ষ হিংস্রপ্রাণীর স্বভাবটি তাহার এখতিয়ারী। আবার অনেক সময় কোন বস্তুর এমন স্বভাব-ধর্মের কারণে খওফ পয়দা হয় যেই স্বভাব-ধর্মটি তাহার এখতিয়ারী নহে। যেমন পানির প্রচণ্ড শ্রোত ও আগুনের দাহনশক্তি।

সারকথা হইল, অনিষ্টকর বিষয়ের এলেমের কারণে মানুষের অন্তরে যেই দুশ্চিন্তা ও দুর্ভাবনা সৃষ্টি হয় উহাই খওফ। এই খওফ আল্লাহকেও করা হয়। মানুষ আল্লাহকে ভয় করে– কখনো গোনাহের কারণে, আবার কখনো আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকেফ হওয়ার কারণে। আল্লাহ পাক যদি ইচ্ছা করেন তবে সমস্ত পৃথিবীকে ধ্বংস করিয়া দিতে পারেন এবং এই বিষয়ে তিনি কিছুমাত্র পরওয়া করিবেন না। এই কাজে তাহাকে কেহ বাধাও দিতে পারিবে না। সুতরাং দেখা যাইতেছে, মানুষ দুই কারণে আল্লাহকে ভয় করে। নিজের কৃত গোনাহের আধিক্যের কারণে কিংবা আল্লাহ পাকের শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকেফ হওয়ার কারণে। আবার অনেক সময় মানব মনে এই উভয়বিধ কারণ একত্রিত হওয়ার কারণেও আল্লাহকে ভয় করা হয়। মানুষ নিজের কৃত অপরাধ সম্পর্কে যেই পরিমাণ সচেতন হইবে এবং সে এই কথা যত বেশী পরিমাণ জানিতে পারিবে যে, আল্লাহ পাকের শক্তি অসীম, কোন কাজেই কাহারো নিকট তিনি কোন জবাবদিহি করিতে বাধ্য নহেন এবং বান্দাকে তাহার সকল কাজের জন্যই জবাবদিহি করিতে হইবে– এই সকল বিষয় মানুষ যত জানিতে পারিবে

তাহার অন্তরের খওফও সেই পরিমাণই বেশী হইবে।

উপরের বিশ্লেষণ দ্বারা এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, ঐ ব্যক্তিই আল্লাহকে বেশী ভয় করিবে যে নিজেকে বেশী পরিমাণে চিনিতে পারিবে এবং আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার পরিচয় যে যত বেশী লাভ করিবে। এই কারণেই রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেনঃ আল্লাহর শপথ! তোমাদের তুলনায় আমি আল্লাহকে বেশী ভয় করি। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

অর্থাৎ– বান্দাদের মধ্যে জ্ঞানীরাই কেবল তাঁহাকে ভয় করে।

এই জ্ঞান যখন পূর্ণ হয় তখন উহার কারণে অন্তরে খওফ ও ভয় পয়দা হয়। অন্তরে সৃষ্ট ঐ ভয়ের প্রবাভ দেহ ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে প্রকাশ পায়। ফলে দেহ হয় শীর্ণ-দুর্বল ও ফ্যাকাশে। এই সময় মানুষের মধ্যে ক্রন্দন, আহাজারী, চিৎকার এবং সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়া– ইত্যাদি অবস্থাগুলি প্রকাশ পায়। অনেক সময় এই সকল অবস্থার চরম বিকাশ মানুষের মৃত্যুরও কারণ হয়। মানব অন্তরে সৃষ্ট এই দাহন যদি মস্তিষ্কে গিয়া ক্রিয়া করে তবে উহার ফলে মস্তিষ্কবিকৃতি ঘটে এবং এই দাহন যদি শক্তিশালী হয় তবে মানুষের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে যাবতীয় পাপাচার হইতে ফিরাইয়া রাখে এবং আল্লাহ পাকের আনুগত্যের কাজে ব্যাপৃত রাখে যেন অতীতের কৃত অপরাধের ক্ষতিপূরণ করিয়া ভবিষ্যতে নেক আমল করার যোগ্যতা পয়দা হয়। এই কারণেই বলা হয়– খায়েফ বা খওফকারী ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় না, যেই ব্যক্তি কিছু সময় রোনাজারী ও কান্নাকাটি করিয়াই চোখ মুছিয়া ফেলে। বরং যথার্থ খওফকারী ঐ ব্যক্তি, যে খওফ ও ভয়ের কাজ পরিত্যাগ করে। আবুল কাসেম হাকীম বলেনঃ যেই ব্যক্তি কোন কিছুকে ভয় করে, সে ঐ বস্তু হইতে পলায়ন করে; আর যেই ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে সে আল্লাহর দিকে ধাবিত হয়।

প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত জুন্নুন মিশরীকে কেহ প্রশ্ন করিলঃ মানুষ কখন খওফকারী হয়? জবাবে তিনি বলিলেন, মানুষ যখন নিজেকে রোগীর মত মনে করে এবং রোগবৃদ্ধির আশংকায় উহা হইতে পরহেজ করে।

মানুষের অন্তরে যখন খওফ বিরাজ করে, তখন উহার প্রভাবে নফসের যাবতীয় খাহেশাত দূরীভূত হইয়া উহা বিস্বাদে পরিণত হয়। ফলে এক সময় যেই গোনাহ ছিল প্রিয়, এই পর্যায়ে উহা অপ্রিয় মনে হইতে থাকে। যেমন মধু

পানে আগ্রহী ব্যক্তি যখন জানিতে পারে যে, মধুর সঙ্গে বিষ মিশ্রিত আছে, তখন প্রাণনাশের খওফে মধু পানের আগ্রহ দূর হইয়া যায়। এইভাবে খওফের কারণে মনের অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ ও প্রবৃত্তির যাবতীয় বাসনা দূর হইয়া তদস্থলে বিনয়-তাওয়াজু, মোরাক্বাবা, মোহাছাবা ও আত্মশুদ্ধির উপায়সমূহ আসন গাড়িয়া লয়। এই সময় বান্দা নিজের প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস, প্রতিটি কদম এবং জবান হইতে উচ্চারিত প্রতিটি শব্দ এমনভাবে হিসাব করিয়া খরচ করিবে যেন জীবনের একটি ক্ষুদ্র মুহূর্তও নষ্ট হইতে না পারে। এই ব্যক্তির অবস্থা যেন সেই ব্যক্তির মত, যেই ব্যক্তি কোন হিংস্রপ্রাণীর আক্রমণে পতিত হওয়ার পর যখন সে জানিতে পারিবে যে, এখন সে উহার আহারে পরিণত হইয়া জীবন হারাইতে বসিয়াছে, তখন সে নিজের চিন্তা-চেতনা ও শক্তি-সামর্থ্যের সকল কিছু একত্রিত করিয়া উহার হাত হইতে প্রাণ রক্ষার কৌশল অবলম্বনে এমনভাবে নিবিষ্ট হইবে যে, এই সময় পৃথিবীর অন্য কিছুই তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারিবে না। তো মানুষের অন্তরে যখন খওফ গালেব ও প্রবল হয় তখন তাহার আবস্থাও এইরূপ হইয়া থাকে।

ছাহাবায়ে কেরাম ও কতক তাবেয়ীনের অবস্থাও এইরূপ ছিল। মানুষ নিজের অপরাধ ও উহার কারণে প্রাপ্য শাস্তি এবং আল্লাহ পাকের জালাল ও শক্তি-ক্ষমতা সম্পর্কে যেই পরিমাণ সচেতন হইবে, তাহার অন্তরে সেই পরিমাণই খওফ পয়দা হইবে।

শরীয়তে পরহেজগারীর স্তর

মানুষের আমলে 'খওফ' বিকাশের সর্বনিম্ন স্তর হইল, শরীয়তে যাহা হারাম ও নিষিদ্ধ উহা হইতে বিরত থাকা। আর শরীয়তে যেই সকল বিষয় নিশ্চিতরূপে হারাম নহে, কিন্তু হারাম হওয়ার সম্ভাবনা আছে, এমন বিষয় হইতেও পরহেজ করিয়া চলার নাম 'তাক্ওয়া'। আরো সোজা কথায়- সন্দেহযুক্ত বিষয়ও পরিহার করিয়া চলা এবং যাহা হালাল বলিয়া নিশ্চিত কেবল উহার উপরই আমল করার নাম তাকওয়া। অনুরূপভাবে যাহা হালাল বটে কিন্তু উহা না হইলেও কোন ক্ষতি নাই, কেবল সন্দেহের খওফের কারণেই উহা তরক করা- ইহার নাম 'সিদক ফিত্তাক্ওয়া'। সেই সঙ্গে যদি ইহাও সংযুক্ত হয় যে, কেবল প্রয়োজনীয় বস্তু ব্যবহার করা হয় এবং যাহা অপ্রয়োজনীয় তাহা বর্জন করা হয়; যেমন যেই ঘরটি বসবাসের কাজে ব্যবহার হয় না এমন ঘর নির্মাণ করা হয় না, আহারের জন্য যাহা আবশ্যক নহে এমন বস্তু সঞ্চয় করা হয় না,

অর্থাৎ ক্ষণস্থায়ী দুনিয়ার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করা হয় না এবং মনে করা হয় যে, এই সবই একদিন নিঃশেষ হইয়া যাইবে। সুতরাং প্রতিটি শ্বাস-প্রশ্বাস হিসাব করিয়া করিয়া ব্যয় করা হয় এবং জীবনের একটি মুহূর্তও গায়রুল্লাহর প্রতি নিবদ্ধ করা হয় না, তবে এই স্তরের নাম 'সিদক' এবং এইরূপ ব্যক্তিকে বলা হয় 'সিদ্দিক'। এই স্তরসমূহ এমন যে, স্বাভাবিকভাবেই নীচের স্তরসমূহ উপরে স্তরের আওতায় আসিয়া যায়। যেমন 'সিদক' এর অন্তর্ভুক্ত হইল 'তাকওয়া' এবং তাকওয়ার অন্তর্ভুক্ত 'ওরা' এবং 'ইফ্ফত' ওরার অন্তর্ভুক্ত। কারণ, কামপ্রবৃত্তি হইতে বিরত থাকার নাম 'ইফ্ফত'।

বিষয়টা আরো স্পষ্ট হওয়া আবশ্যক। মনে কর, কতক কর্ম হইতে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে বিরত রাখা এবং কতক কর্মে অগ্রসর ও তৎপর হওয়ার মাধ্যমেও খওফের প্রভাব জাহির হয়। তবে শরীয়তে বিশেষ কর্ম হইতে বিরত থাকাকে বিশেষ নামে অভিহিত করা হয়। যেমন শাহওয়াত ও কামপ্রবৃত্তি হইতে বিরত থাকাকে বলা হয় 'ইফ্ফত'। উহার উপরের স্তরের নাম 'ওরা'। ওরার পরিধি বিস্তৃত। অর্থাৎ, যাবতীয় নিষিদ্ধ বিষয় হইতে বিরত থাকাকে বলা হয় 'ওরা' এবং এই স্তরের জন্য কেবল কাম প্রবৃত্তি হইতে বাঁচিয়া থাকাকে নির্দিষ্ট করা হয় নাই। অনুরূপভাবে 'ওরা'-এর উপরের স্তর হইল 'তাকওয়া'। কারণ, "যাবতীয় নিষিদ্ধ ও সন্দেহযুক্ত"- এই উভয়বিধ কর্ম হইতে পরহেজ করার নাম 'তাকওয়া'। এই শ্রেণীতে সকলের উপরের স্তরের নাম 'সিদ্ক ও কুরব'। এই 'সিদ্ক ও কুরব'-এর গণ্ডি হইল, সন্দেহের কারণে বৈধ বিষয় হইতেও পরহেজ করা।

উপরে বর্ণিত স্তরসমূহ একটি অপরটির উপরে বিধায় সর্বোচ্চ স্তরের মধ্যে নিম্নের স্তরগুলি আসিয়া যায়। যেমন কাহারো বংশীয় স্তরের ক্ষেত্রে যদি বলা হয়- লোকটি আরবী না আজমী? যদি আরবী হয় তবে সে কোরাইশী না হামেশী? যদি হাশেমী হয় তবে সে হযরত আলী (রাঃ)-এর আওলাদের অন্তর্ভুক্ত কিনা? যদি হযরত আলী (রাঃ)-এর আওলাদের অন্তর্ভুক্ত হয় তবে সে হাছানী, না হোছাইনী? এখানে বর্ণিত স্তর সমূহের মধ্যে যদি কেহ হাছানী বা হোছাইনী হয় তবে তাহার মধ্যে আরবী, হাশেমী এবং কোরাইশ ইত্যাদি স্তরসমূহও আসিয়া যাইবে। সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি 'সিদ্দিক' এর স্তরে উপনীত হন, তবে তাঁহাকে মোত্তাকী, 'ছাহেবে ওরা' এবং ইফ্ফতওয়ালাও বলা হইবে।

খওফের স্তর

ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, খওফ একটি উত্তম বিষয়। তবে ইহা দ্বারা যেন এইরূপ ধারণা করা না হয় যে, 'খওফ' যেহেতু একটি উত্তম বিষয় সুতরাং উহা যত শক্তিশালী হইবে ততই মঙ্গল। এই ধারণা ঠিক নহে। কারণ, খওফ হইল একটি চাবুক, যাহা দ্বারা আল্লাহ বান্দাকে এলেম ও আমলের দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যান, যেন বান্দা এই দুইটি বিষয় দ্বারা আল্লাহ পাকের নৈকট্যের স্তর হাসিল করিতে পারে। এই কারণেই বলা হয়– চতুষ্পদ জন্তু ও দুষ্ট বালকদের সম্মুখ হইতে কখনো বেত্রদণ্ড সরাইয়া ফেলিতে নাই। অন্যথায় তাহারা উশৃংখল হইয়া যাইবে। তবে উহার অর্থ ইহাও নহে যে, অধিক প্রহার করিলেই ভাল ফল পাওয়া যাইবে। বরং উহারও একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। অনুরূপভাবে খওফেরও কম বেশী মাত্রা আছে এবং উহার মধ্যে মধ্যম মাত্রাই উত্তম। স্বল্প মাত্রার খওফকে নারীদের কান্নার সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে। এই কোমলমতি নারীদের অবস্থা হইল, কোরআনের কোন আয়াত বা ভীতিকর কোন বিবরণ শুনিলে সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের চোখে পানি আসিয়া পড়ে এবং বিবরণ শেষ হওয়ার পরই আবার সেই আগের অবস্থায় ফিরিয়া যায়। এই ধরনের খওফ মধ্যবর্তী মাত্রার চেয়ে কম এবং ইহা দ্বারা উপকারও খুব কমই হইয়া থাকে। উহার উদাহরণ এইরূপ– যেন কোন বিশালদেহী ও শক্তিশালী প্রাণীকে কোন নরম ও সরু বৃক্ষডাল দ্বারা আঘাত করা হইল। এমন আঘাত দ্বারা না সে ব্যথা পাইবে, না সোজা পথে ফিরিয়া আসিবে। সাধারণ মানুষের খওফের অবস্থাও অনেকটা এইরূপ। অবশ্য আরেফ ও আলেমগণের অবস্থা এইরূপ নহে।

আমাদের 'আলেম' দ্বারা সেই সকল ব্যক্তিদের কথা বোঝানো উদ্দেশ্য নহে, যাহারা কেবল লেবাস-পোশাকেই আলেম সাজিয়া বসিয়া আছেন। তাহারা তো বরং সর্বাধিক নির্ভয় ও খওফহীন। আমাদের বর্ণিত 'আলেম' দ্বারা সেই সকল ব্যক্তিদের কথাই বোঝানো উদ্দেশ্য যাহারা আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভ করিয়াছেন এবং আল্লাহর নেয়মত ও তাহার বিধানাবলী সম্পর্কে অবগত। অবশ্য হালে এইরূপ আলেমের সংখ্যা বিরল বটে।

হযরত ফোজায়েল ইবনে আয়াজ (রহঃ) বলেন, তোমাকে যদি কেহ প্রশ্ন করে যে, তুমি কি আল্লাহকে ভয় কর? তবে উহার জবাবে তুমি নিশ্চুপ থাকিও। কারণ, এই প্রশ্নের জবাবে তুমি যদি 'হাঁ' বল তবে তুমি মিথ্যাবাদী হইবে। সুতরাং দেখা যাইতেছে, প্রকৃত খাওফ হইল এমন বিষয় যাহা মানুষের

অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পাপাচার হইতে ফিরাইয়া রাখিয়া আল্লাহর এবাদত ও আনুগত্যের দিকে ধাবিত করে। মানব অঙ্গে যতক্ষণ খওফের এই তাছীর ফুটিয়া না উঠিবে, ততক্ষণ উহাকে প্রকৃত খওফ বলা যাইবে না। উহা বরং মনের ওয়াসওয়াসা ছাড়া আর কিছুই নহে।

মধ্যম স্তরের অতিরিক্ত খওফ হইল যেই খওফ দ্বারা মানুষ আমলে উৎসাহিত হওয়ার পরিবর্তে চরম নৈরাশ্যে নিপতিত হয়। এইরূপ নৈরাশ্য নিষিদ্ধ এবং ইহা আমলের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। সুতরাং যেই খওফ দ্বারা মানুষের আমল ব্যহত হয় উহা কখনো কল্যাণকর হইতে পারে না। উহা বরং ক্ষতিকর। এই খওফ ক্ষতিকর হওয়ার কারণ দুইটি– অজ্ঞতা ও অক্ষমতা। অজ্ঞতা এইভাবে যে, এই ক্ষেত্রে খায়েফ (খওফকারী) নিজের পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ হওয়া। কেননা, খায়েফ যদি নিজের পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞ না হইত তবে সে এমন মাত্রাতিরিক্ত খায়েফ হইত না। কারণ খায়েফ ও অতিরিক্ত ভীত ব্যক্তিই নিজের পরিণাম সম্পর্কে সন্দিহান থাকে।

অতিরিক্ত খওফ ক্ষতিকর হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হইল– অক্ষমতা। অর্থাৎ, এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি এমন সমস্যার শিকার হয় যে, সে উহা দূর করিতে সক্ষম হয় না। মোটকথা, মধ্যম স্তরের অতিরিক্ত খওফ যাহা নৈরাশ্য সৃষ্টি করে তাহা নিন্দনীয় ও ক্ষতিকর। এই জাতীয় খওফ অনেক সময় রোগ, পেরেশানী, দুর্বলতা, মস্তিষ্ক বিকৃতি, সংজ্ঞাহীনতা এমনকি মৃত্যুরও কারণ হইয়া থাকে। যেমন, শাসনের ক্ষেত্রে অতিরিক্ত প্রহারের ফলে শিশুরা অনেক সময় অসুস্থ হইয়া পড়ে। এই প্রহার অনেক সময় তাহাদের অঙ্গহানী বা মৃত্যুরও কারণ হইতে পারে। এই মাত্রাতিরিক্ত খওফের প্রতিকারের উদ্দেশ্যেই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রিজার পর্যাপ্ত উপকরণ বর্ণনা করিয়াছেন।

বস্তুতঃ মানুষের জন্য কাম্য বস্তুর মধ্যে উহাই উত্তম হইতে পারে, যাহা দ্বারা মানুষের উদ্দেশ্য হাসিল হয়। কিন্তু উহা দ্বারা যদি মানুষ লক্ষ্যমাত্রা পর্যন্ত পৌঁছাইতে না পারে কিংবা লক্ষ্যমাত্রা অতিক্রম করিয়া যায় তবে অবশ্যই উহা নিন্দনীয় বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। সুতরাং খওফের উদ্দেশ্য যদি হয়– মোজাহাদা-মোযাকারা, জিকির-ফিকির, এবাদত-আনুগত্য তথা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাইবার যাবতীয় উপায়-উপকরণ অবলম্বন করা; তবে উহার জন্য আবশ্যক জীবনে সুস্থ-সবল ও সজ্ঞান অবস্থায় বাঁচিয়া থাকা। সুতরাং যেই 'খওফ' এই সকল উপায়-উপকরণ অবলম্বনে অন্তরায় সৃষ্টি করে, তাহা নিন্দনীয় হওয়াই স্বাভাবিক। যদি বলা হয়, আল্লাহর ভয়ে কেহ মৃত্যুবরণ করিলে সে তো

শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করিবে, এই ক্ষেত্রে এই খওফকে নিন্দনীয় বলার যুক্তি কি? উহার জবাবে আমরা বলিব, এই ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি শাহাদাতের মর্যাদা পাইবে বটে। কিন্তু মনে কর, ঐ ব্যক্তি যদি এই সময় মৃত্যুবরণ না করিয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করার মাধ্যমে আল্লাহর এবাদত-আনুগত্যের পথে অগ্রসর হইয়া আরেফের স্তর পর্যন্ত তরক্কী লাভ করিতে পারিত, তবে এই পথে সে প্রতি মুহূর্তে একেক জন শহীদের মরতবা লাভ করিয়া যেন অসংখ্য শহীদের মর্যাদা লাভ করিতে পারিত।

উপরের যুক্তি যদি স্বীকার করা না হয়, তবে তো ইহাও মানিতে হইবে যে, কোন ব্যক্তি যদি কতল হয় কিংবা কাহাকেও যদি কোন জীব-জানোয়ার ফাড়িয়া চিরিয়া খাইয়া ফেলে, তবে সে এমন ওলী-বুজুর্গ হইতে উত্তম মর্যাদা লাভ করিবে, যাহারা স্বাভাবিক মৃত্যু প্রাপ্ত হন। কিন্তু এইরূপ হওয়া সম্ভব নহে। সুতরাং কখনো এইরূপ মনে করা যাইবে না যে, খওফের কারণে মৃত্যুবরণ করা উত্তম। বরং উত্তম হইল এমন জীবন লাভ করা যাহা আল্লাহ পাকের এবাদত ও আনুগত্যে অতিবাহিত হয়। অবশ্য এইভাবে জীবনপাত করিয়া শাহাদাতের মর্যাদা লাভ যদিও কল্যাণকর হয়, কিন্তু উহা দ্বারা সিদ্দিকীনগণের মর্যাদা লাভ করা যাইবে না।

সারকথা হইল, এমন খওফ যাহা মানুষের আমলে কোন ক্রিয়া করে না, উহা থাকা না থাকা বরাবর। যেমন চাবুকের প্রহার দ্বারা যদি ঘোড়ার গতি বৃদ্ধি না হয় তবে এই প্রহার অর্থহীন। সুতরাং খওফ যদি আমলে ক্রিয়া করে তবে যেই পরিমাণ ক্রিয়া করিবে, বান্দার মর্যাদা সেই পরিমাণই বৃদ্ধি পাইবে। যেমন খওফের কারণে যদি কেবল কুপ্রবৃত্তি হইতেই বিরত থাকে তবে উহা দ্বারা ইফ্ফতের স্তর অর্জিত হইবে। আর এই খওফ যদি 'ওরা' বা পরহেজগারী হাসিলের কারণ হয় তবে উহা দ্বারা আমলের স্তর পূর্বাপেক্ষা কিছুটা বেশী অর্জিত হইবে।

আমলের ক্ষেত্রে সর্বাপেক্ষা উঁচু স্তর হইল সিদ্দিকীনগণের স্তর। এই স্তরে উপনীত হওয়ার পর মানুষের জাহের-বাতেন ও ভিতর-বাহিরে কেবল আল্লাহ অবস্থান করেন এবং তথায় গায়রুল্লাহর অবস্থানের কোন সুযোগ থাকে না। খওফের এই স্তরটি সর্বাপেক্ষা প্রশংসনীয় এবং ইহা শরীর ও মস্তিষ্কের সুস্থতা দ্বারাই অর্জিত হইতে পারে। কাহারো খওফ যদি সীমা অতিক্রম করিয়া বিবেক ও সুস্থতা বিনষ্ট করিয়া দেয়, তবে এই পর্যায়কে ব্যাধি মনে করিয়া রিজা ইত্যাদি দ্বারা তাহার চিকিৎসা করা জরুরী মনে করিতে হইবে। হযরত ছহল

তশতরীর কতক মুরীদ দীর্ঘ দিন উপবাস করিতেন। তিনি তাহাদিগকে বলিতেন, সর্বদা আপন মস্তিষ্কের যত্ন লইবে। কেননা, আল্লাহর ওলীগণের মধ্যে কাহারো মস্তিষ্কই দুর্বল ছিল না।

খওফের ফজীলত

ইতিপূর্বেই আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, কোন মন্দ বিষয়ের আশংকা করাকেই খওফ বলা হয়। এই মন্দ বিষয় দুই প্রকার। প্রথমতঃ বিষয়টি আপন সত্ত্বাতেই মন্দ, যেমন– দোজখের আগুন। দ্বিতীয়তঃ এমন বিষয় যাহা অপর কোন মন্দ বিষয়ের কারণ হয়। যেমন গোনাহকে মানুষ এই কারণে মন্দ মনে করে যে, উহার কারণে পরকালে আজাব ভোগ করিতে হইবে। অনুরূপভাবে যেমন রোগাক্রান্ত ব্যক্তি ক্ষতিকারক ফলকে এই কারণে খারাপ মনে করে যে, উহা রোগবৃদ্ধি কিংবা মৃত্যুরও কারণ হইতে পারে।

এক্ষণে খায়েফ (খওফকারী) নিজেই ইহা স্থির করিয়া লইবে যে, তাহার খওফের কারণ কোন্‌টি। কারণ নির্দিষ্ট হওয়ার পর উহার বরাবরে মনের খওফ এই পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে থাকিবে যেন অন্তরে জ্বলন পয়দা হয়। এই খায়েফগণের অবস্থা দুই প্রকার।

প্রথমতঃ সেই সকল ব্যক্তি যাহাদের অন্তরে এমন কোন বিষয়ের প্রাবল্য সৃষ্টি হয় যাহা স্বয়ং কোন মন্দ বিষয় নহে কিন্তু অপর কোন মন্দ বিষয়ের কারণ হওয়ার কারণে উহাও মন্দ বিষয়ে পরিণত হয়। যেমন কতক ব্যক্তি তওবার পূর্বেই মৃত্যু হইয়া যাওয়ার কারণে খওফ করে। কেহ খওফ করে তওবা ভঙ্গ হইয়া যাওয়ার আশংকায়। এই শ্রেণীতে আবার কতক ব্যক্তি আল্লাহ পাকের হকসমূহ আদায় করার পূর্বেই দুর্বল হইয়া পড়া কিংবা অন্তরের বিনয়-বিনম্র ভাব দূর হইয়া সখ্‌তী ও কঠোর স্বভাব পয়দা হইয়া যাওয়ার আশংকা করে। অনুরূপভাবে অন্তরের 'এস্তেকামাত' বা নেক আমলে মনের স্থির-অটল ভাব পরিবর্তিত হইয়া শাহ্‌ওয়াত ও কুপ্রবৃত্তির অনুগত হইয়া যাওয়ার খওফ কিংবা এমন খওফ বা আশংকা করা যে, আল্লাহ পাক যেন আমাদিগকে পার্থিব নাজ-নেয়মত ও বিষয়-সম্পদের উপর ছাড়িয়া না দেন, যাহা দ্বারা আমরা দুনিয়াতে আরাম-আয়েস ও লোকসমাজে ইজ্জত-সম্মান লাভ করিতেছি। কিংবা আল্লাহর নেয়মতসমূহ ছিনাইয়া লওয়ার ভয় অথবা আল্লাহর পথ হইতে মুখ ফিরাইয়া গায়রুল্লাহর দিকে ধাবিত হওয়ার ভয় কিংবা আল্লাহর আনুগত্য ও এবাদতে যেই ত্রুটি ও প্রতারণা করা হয় উহা আল্লাহর নিকট জাহের হইয়া

যাওয়ার ভয়, মানুষের গীবত-শেকায়েত, হিংসা-বিদ্বেষ ও মানুষের সঙ্গে কৃত অসদাচরণের কারণে প্রাপ্য শাস্তির ভয় কিংবা এই ভয় যে, জানি না অবশিষ্ট জীবনে আল্লাহর আরো কত কি নাফরমানী করিয়া ফেলিব, অথবা গোনাহের কারণে দুনিয়াতেই অপমানিত হওয়ার ভয়, কিংবা দুনিয়াতে আরাম-আয়েসের উপকরণ দ্বারা প্রতারিত হওয়ার ভয়, অমঙ্গলজনক মৃত্যুর ভয় কিংবা "জানি না ভাগ্যের লিখন কি আছে" এই ভয়।

মোটকথা, আল্লাহর আরেফগণ উপরে বর্ণিত নানা বিষয়ের ভয় করিয়া থাকেন। আর বর্ণিত 'খওফ' সমূহের প্রতিটি 'খওফ' দ্বারা পৃথক পৃথক ফায়দা পাওয়া যাইবে। অর্থাৎ মানুষ যেই বিষয় হইতে খওফ করিবে উহা হইতে বাঁচিয়া থাকার চেষ্টা করিবে। যেমন কোন ব্যক্তি যদি কোন অপরাধে অভ্যস্ত হইয়া পড়ার ভয় করে তবে সে ঐ অভ্যাস ত্যাগ করার চেষ্টা করিবে এবং যেই ব্যক্তি এমন খওফ ও আশংকা করিবে যে, আল্লাহ পাক আমার অন্তরের গাফলত সম্পর্কে অবগত, তবে সে নিজের অন্তরের সাফাই'র ফিকির করিয়া স্বীয় অন্তরকে সর্বপ্রকার শয়তানী ওয়াসওয়াসা হইতে পাক করার চেষ্টা করিবে। অর্থাৎ এইভাবেই অপরাপর বিষয়সমূহও কেয়াস করিয়া লইতে হইবে। তবে বর্ণিত খওফসমূহের মধ্যে মোত্তাকীগণ নিজের খাতেমা ও মৃত্যু সম্পর্কেই অধিক খওফ করিয়া থাকেন। তবে এই ক্ষেত্রে সর্বোৎকৃষ্ট ও শ্রেষ্ঠ স্তর হইল যাহারা আল্লাহর স্থিরকৃত ভাগ্যের ব্যাপারে খওফ করেন।

মানুষের খাতেমা ও মৃত্যুকালীন অবস্থা হইল সেই পূর্বস্থিরকৃত তক্বদীরেরই ফসল বা উহার শাখা। এই বিশ্লেষণের আলোকে বলিতে হয়, মানুষের তাক্বদীর ও মৃত্যুর মধ্যখানে মানব জীবনের ক্রিয়াকর্ম যেন একটি প্রাসঙ্গিক বিষয়। লওহে মাহফুজে যাহা লেখা থাকে সেইভাবেই মানুষের মৃত্যু হয়। এখন প্রশ্ন হইল, এক ব্যক্তি নিজের ভাগ্যে যাহা লেখা আছে উহাকে ভয় করিতেছে। আরেক ব্যক্তি নিজের খাতেমা ও মৃত্যুকালীন অবস্থাকে খওফ করিতেছে, এই দুই ব্যক্তির মধ্যে পার্থক্য কি? বিষয়টাকে একটি উদাহরণ দ্বারা আলোচনা করা যাক।

মনে কর, দুই ব্যক্তি সম্পর্কে বাদশাহ কোন ফরমান লিখিয়া দিয়াছেন। কিন্তু এই রাজফরমানে কি লেখা আছে তাহা কাহারো জানা নাই। অর্থাৎ ইহাতে হত্যার নির্দেশ কিংবা রাজ দরবারে কোন পদপ্রাপ্তির নির্দেশও থাকিতে পারে। কিন্তু ফরমানটি এখনো তাহাদের নিকট পৌঁছায় নাই। এই ক্ষেত্রে এক ব্যক্তি রাজার ফরমানটি হস্তগত হওয়ার সময়টির কথা চিন্তা করিয়া খওফ

করিতেছে যে, না জানি উহা খুলিয়া কি দেখিতে পাইব। কিন্তু দ্বিতীয় ব্যক্তির খওফের নজর অন্য দিকে। সে খওফ করিতেছে, সেই সময়টির উপর যেই সময় বাদশাহ ফরমানটি লিখিয়াছেন। অর্থাৎ, বাদশাহ কি তখন ক্রুদ্ধ ও গজবের হালাতে ছিলেন, না প্রফুল্লচিত্ত ছিলেন– সেই হালাতের উপর।

বলাবাহুল্য উপরোক্ত উদাহরণের ক্ষেত্রে শেষোক্ত ব্যক্তির খওফকেই উত্তম বলিতে হইবে এই কারণে যে, বাদশাহর ফরমান খুলিয়া তথা মৃত্যুর সময় আমার অবস্থা কেমন দেখিতে পাইব ইহা বড় কথা নহে; বরং আমার তাকদীরে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়া গিয়াছে, মৃত্যুকালে উহাই প্রকাশ পাইবে।

একদা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বরে আরোহণের পর নিজের ডান হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ফরমাইলেন– ইহা আল্লাহ পাকের লিখন। ইহাতে জান্নাতবাসীদের নাম এবং তাহাদের পিতার নাম লিখা আছে। ইহাতে কোন প্রকার কম বেশী করা হইবে না। অতঃপর বাম হাত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া ফরমাইলেন– ইহা আল্লাহ পাকের লিখন। ইহাতে দোজখীদের নাম এবং তাহাদের পিতার নাম লিখা আছে। ইহাতে কোন প্রকার কম-বেশী করা হইবে না। তাকদীরে যাহারা সৌভাগ্যবান (বলিয়া সাব্যস্ত করা আছে) তাহারা হতভাগ্যদের মত আমল করিবে। এমনকি লোকেরা তাহাদের সম্পর্কে বলিবে, ইহারাও যেন হতভাগ্যদেরই অন্তর্ভুক্ত। বরং নিশ্চিতভাবেই তাহারা হত্যভাগ্যই বটে। কিন্তু আল্লাহ তায়ালা মৃত্যুর পূর্বে চাই তাহা এক মুহূর্ত পূর্বেই হউক, তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া লইবেন।

পক্ষান্তরে তাকদীরে যাহারা হতভাগ্য, তাহারা নেক মানুষের মত কাজ করিবে। এমনকি লোকেরা তাহাদের সম্পর্কে বলিবে, ইহারাও যেন সৌভাগ্যবান, বরং নিশ্চিতভাবেই ভাগ্যবান বটে, কিন্তু আল্লাহ পাক মৃত্যুর পূর্বে চাই উহা সামান্য পূর্বেই হউক, নেক লোকদের জামায়াত হইতে তাহাদিগকে বহিষ্কার করিয়া দিবেন।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, সেই ব্যক্তিগণই নেক ও সৌভাগ্যবান আল্লাহ পাক যাহাদিগকে 'নেক' বলিয়া সাব্যস্ত করিয়া রাখিয়াছেন এবং সেই ব্যক্তিরাই হতভাগ্য যাহাদের তাক্বদীরে দুর্ভাগ্যের কলম চালনা হইয়া গিয়াছে।

ইতিপূর্বে যেই দুই ব্যক্তির খওফের কথা উল্লেখ করা হইয়াছে তাহাদের অবস্থা এইভাবেও বর্ণনা করা যাইতে পারে, যেমন– এক ব্যক্তি নিজের কৃত অপরাধ ও গোনাহের কারণে খওফ করিতেছে। অপর ব্যক্তি স্বয়ং আল্লাহকে খওফ করিতেছে এই কারণে যে, সে আল্লাহর রো'ব ও জালাল এবং তাঁহার

শক্তি-ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত। এই ক্ষেত্রে খওফের স্তর হিসাবে শেষোক্ত ব্যক্তির অবস্থানই উত্তম এবং এই ব্যক্তির খওফ স্থায়ী হইবে।

(ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই যে, এই শেষোক্ত ব্যক্তি আল্লাহ পাকের শক্তি ও ক্ষমতা সম্পর্কে অবগত হওয়ার কারণেই আল্লাহকে খওফ করিতেছে। তো আল্লাহর শক্তি যেহেতু চিরস্থায়ী, সুতরাং তাহার খওফও স্থায়ী হওয়া যুক্তিসঙ্গত– বঙ্গানুবাদক)।

পক্ষান্তরে প্রথমোক্ত ব্যক্তি যদি সিদ্দিকীনগণের মতও আমল করে তথাপি তাহার অবস্থান দুর্বল এবং সে যেকোন সময় প্রতারিত হওয়ার সম্ভাবনা রহিয়াছে। অবশ্য এই নেক আমলে স্থির থাকিলে উহার সুফল ও শান্তি লাভ হইবে বটে।

সারকথা হইল, গোনাহকে ভয় করা ইহা নেককারদের খওফ এবং আল্লাহকে ভয় করা ইহা সিদ্দিকীনগণের খওফ। আর এই খওফ আল্লাহর মারেফাতেরই ফসল। যেই ব্যক্তি আল্লাহর পরিচয় লাভ করে এবং আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতা সম্পর্কে অবহিত হয়, সেই ব্যক্তি কোন প্রকার গোনাহ না করিলেও তাহার পক্ষে আল্লাহকে ভয় করাই স্বাভাবিক। বরং আল্লাহর কুদরত ও ক্ষমতা সম্পর্কে ওয়াকেফ হওয়ার পর একজন গোনাহগারের পক্ষেও গোনাহের পরিবর্তে স্বয়ং আল্লাহ পাককে ভয় করাই বাঞ্ছনীয়। একজন গোনাহগার নিজের গোনাহের কারণেই আল্লাহকে ভয় করে। এক্ষণে আল্লাহ পাক যদি বান্দার অন্তরে 'আল্লাহর ভয়' পয়দা করিতে না চাহিতেন তবে বান্দার সামনে গোনাহের সুযোগ সৃষ্টি করিতেন না।

আল্লাহ পাকের জালাল ও কুদরতের শান এমন যে, তিনি যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন এবং কোন বিষয়েই তিনি জবাবদিহি করিতে বাধ্য নহেন। সুতরাং এমন সত্ত্বাকে সর্বদা ভয় করাই বাঞ্ছনীয়।

একজন অপরাধী গোনাহ করার পূর্বে তাহার মধ্যে এমন কোন অপরাধ ছিল না যাহার কারণে গোনাহের যাবতীয় উপায়-উপকরণ তাহার সম্মুখে আনিয়া হাজির করিয়া তাহাকে গোনাহের কাজে লিপ্ত করা যাইতে পারে। অনুরূপভাবে একজন আবেদ ব্যক্তি এবাদত করার পূর্বে তাহার মধ্যে এমন কোন উছিলা ও গুণ ছিল না যাহার কারণে এবাদত ও আনুগত্যের যাবতীয় আসবাব তাহার সম্মুখে হাজির করিয়া তাহাকে এবাদতে লিপ্ত করা যাইতে পারে। সুতরাং গোনাহগার ইচ্ছা করুক আর না করুক, তাহাকে গোনাহ করিতে হইবে এবং একজন আবেদ এবাদতের পথ পছন্দ করুক আর না করুক, তাহাকেও এবাদত

করিতে হইবে। আল্লাহ পাকের বেনিয়াজ ও লাপরওয়া দরবারের এমনই অবস্থা যে, তিনি কোন পূর্বকারণ ছাড়াই মোহাম্মদ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সর্বোচ্চ মর্যাদা দান করিলেন এবং আবু জাহেলকে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিপতিত করিলেন। অথচ আবু জাহেল ইতিপূর্বে কোন অপরাধে লিপ্ত ছিল না।

একটু গভীরভাবে লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে, মানুষের এবাদতের প্রক্রিয়া হইল– প্রথমে আল্লাহ পাক মানুষের অন্তরে এবাদতের এরাদা বদ্ধমূল করিয়া দেন। অতঃপর তাহাকে এবাদত করার শক্তি দান করেন। সুতরাং এবাদতের পাক্কা এরাদা এবং উহা সম্পাদন করার যথাযথ শক্তি সঞ্চিত হওয়ার পর উহার বাস্তবায়ন অপরিহার্য। অনুরূপভাবে গোনাহগারও এইভাবে গোনাহের কাজে অগ্রসর হয় যে, প্রথমে তাহার অন্তরে গোনাহের পাক্কা এরাদা জমাইয়া দেওয়া হয়। অতঃপর উহা সম্পাদন করার শক্তি ও যাবতীয় উপায়-উপকরণ তাহার জন্য সহজ করিয়া দেওয়া হয়। এমতাবস্থায় গোনাহে জড়াইয়া পড়া তাহার পক্ষে আবশ্যক হইয়া পড়ে।

এখন আমরা এই কথা বলিতে পারিব না যে, কি কারণে প্রথমোক্ত ব্যক্তিকে এবাদত ও আনুগত্যের সুযোগ দান করিয়া তাহাকে সম্মানিত করা হইল এবং কোন্ অপরাধেই বা শেষোক্ত ব্যক্তির অন্তরে গোনাহের এরাদা জন্মাইয়া উহার যাবতীয় ছামান গোযাইয়া দেওয়ার পর তাহাকে গোনাহের কাজে লিপ্ত করা হইল। আর মানুষের আমল যেহেতু আল্লাহ পাকের ইচ্ছার উপরই নির্ভরশীল, সুতরাং উহার জন্য আবার মানুষকেই জবাবদিহি করিতে হইবে কেন, উহাও আমাদের বোধগম্য নহে। সুতরাং প্রতিটি জ্ঞানবান ব্যক্তিকে এই কথা স্বীকার করিতেই হইবে যে, এমন মহান শক্তিধর বেনিয়াজ আল্লাহ জাল্লা শানুহুকে খওফ করাই বাঞ্ছনীয়, যিনি যখন যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন এবং এই বিষয়ে তিনি কাহাকেও কিছুমাত্র পরওয়া করিবেন না। আমরা এতদ্অপেক্ষা আর কিছুই বলিতে পারিব না। কারণ, উহার পরবর্তী অবস্থা তাকুদীরের সহিত সংশ্লিষ্ট এবং উহার আবরণ উন্মোচন করা জায়েজ নহে। অবশ্য শরীয়তে উহারও উদাহরণ বিদ্যমান আছে বটে, কিন্তু এই উদাহরণ দ্বারা সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য উপলব্ধি করা গেলেও উহার কারণ ও রহস্য অনুধাবন করা যাইবে না। যেমন–

আল্লাহ পাক হযরত দাউদ (আঃ)-এর উপর ওহী নাজিল করিলেন যে, "হে দাউদ! তুমি আমাকে এমন ভয় কর, যেমন কষ্টদায়ক হিংস্র প্রাণীকে ভয় করা হয়।" অর্থাৎ এই উদাহরণ দ্বারা আলোচ্য বিষয়ের মতলব উদ্ধার হয় বটে, কিন্তু

উহার মূল কারণ স্পষ্ট হয় না। কারণ, মূল কারণ জানিতে হইলে হুবহু তাক্বদীরের রহস্য অবহিত হওয়া আবশ্যক। আর এই রহস্য আমভাবে সকলকে অবহিত করা হয় না। বরং ইহা কেবল সংশ্লিষ্ট বিষয়ের আহাল ও যথাযোগ্য পাত্রকেই জ্ঞাত করা হয়।

বর্ণিত উদাহরণে হিংস্রপ্রাণীকে যেই ভয় করার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে, উহা এই কারণে নহে যে, ঐ প্রাণীর সঙ্গে কোন অপরাধ করা হইয়াছে। বরং মানুষের উপর চড়াও হওয়ার স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য এবং উহার হিংস্র স্বভাবের কারণেই ঐ প্রাণীকে ভয় করা হয়। এই প্রাণী এমনই স্বেচ্ছাচারী যে, সুযোগ পাইলেই উহারা ঝাপাইয়া পড়িয়া একটি তাজা মানবদেহকে নিমিষে নিঃশেষ করিয়া দিতে কিছুমাত্র পরওয়া করে না। কোন মানুষকে কাবু করার পর যদি ছাড়িয়া দেওয়া হয় তবে উহার কারণও ইহা নহে যে, মানুষের উপর উহার দয়ার উদ্রেক হইয়াছে। বরং মানুষের জীবন ও মৃত্যু উভয়ই উহার নিকট বরাবর। একজন মানুষ কিংবা হাজার মানুষের প্রাণ হনন করিতেও উহার শক্তি-ক্ষমতা ও হিংস্রতায় কিছুমাত্র ব্যবধান সৃষ্টি হয় না। মোটকথা, এই উদাহরণ দ্বারা আলোচ্য প্রসঙ্গের উদ্দেশ্য প্রতিভাত হয়। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীনকে 'খওফ' করার উদাহরণ যে আরো উচ্চতর, এই কথা আল্লাহ নিজেই ঘোষণা করিয়াছেন।

আল্লাহ পাকের পরিচয় লাভের ক্ষেত্রে বাহ্যিক প্রমাণাদি অপেক্ষা আধ্যাত্মিক প্রক্রিয়া অধিকতর কার্যকর ও নির্ভরযোগ্য। যাহারা এই বাতেনী উপায়ে আল্লাহ পাকের পরিচয় পাইয়াছেন তাহারা ভালবাবেই জানিতে পারিয়াছেন, আল্লাহ পাক এমনই বেনিয়াজ যে, তিনি যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে জান্নাত দান করিবেন এবং যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দোজখের আগুনে নিক্ষেপ করিবেন এবং এই বিষয়ে তিনি কিছুমাত্র পরওয়া করিবেন না। মোটকথা, আল্লাহ পাকের এই পরওয়াহীন বৈশিষ্ট্যের মাঝেই খওফের পর্যাপ্ত উপকরণ পাওয়া যাইবে।

দ্বিতীয়তঃ যাহাদের অন্তরে এমন বিষয় বদ্ধমূল হইয়া যায় যাহা স্বয়ং মন্দ। যেমন– মৃত্যুকষ্টের ভয়, মনকির-নকীরের সুয়াল, কবরের আজাব, কবর হইতে পুনরুত্থানের পর আল্লাহ পাকের সামনে হাজির হওয়া, দুনিয়াতে কৃত যাবতীয় আমল সম্পর্কে প্রশ্ন, পুলসিরাত অতিক্রম, দোজখের আগুন, জান্নাত হইতে বঞ্চিত হওয়া কিংবা জান্নাতে কম মর্যাদা পাওয়া এবং আল্লাহ পাকের সঙ্গে হেজাব সৃষ্টি হইয়া যাওয়া ইত্যাদির ভয়। অর্থাৎ, এই বিষয়গুলি এমন যাহা উহার নিজস্ব সত্ত্বাতেই মন্দ বলিয়া বিবেচিত। আর এই ক্ষেত্রেও খওফকারীগণের অবস্থা ভিন্ন ভিন্ন রকম। তবে এই ক্ষেত্রে শেষোক্ত শ্রেণীটি

হইল সর্বোচ্চ স্তরের এবং আরেফগণের অন্তরেই এই খওফ হইয়া থাকে। আর ইহার পূর্বে যেই খওফসমূহের কথা বলা হইয়াছে, উহা আবেদ্বীন, ছালেহীন, জাহেদ্বীন এবং সকল আলেমের মধ্যে হইয়া থাকে।

পক্ষান্তরে যাহাদের মা'রেফাত কামেল নহে এবং যাহাদের অন্তরচক্ষু এখনো পরিস্ফুট হয় নাই, তাহারা আল্লাহর সান্নিধ্য ও জুদায়ী বিষয়ে এখনো অবগত হইতে পারে নাই। তাহাদের সম্মুখে যদি বলা হয়– আরেফগণ দোজখকে ভয় করে না, তাহারা বরং আল্লাহর সঙ্গে হেজাব সৃষ্টি হওয়াকেই ভয় করেন, তবে তাহাদের নিকট এই মন্তব্য গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে হইবে না এবং এই মন্তব্য শুনিয়া তাহারা বিস্ময়বোধ করিবে। এই শ্রেণীর লোকেরা তো বরং আল্লাহর দীদার আস্বাদনকেও অস্বীকার করার পর্যায়ে উপনীত হওয়ার উপক্রম হয়। কিন্তু শরীয়তে যেহেতু উহা অস্বীকার করা জায়েজ নহে, এই কারণে মুখে স্বীকার করে বটে, কিন্তু উহার প্রতি তাহাদের আন্তরিক সমর্থন নাই। এই শ্রেণীর লোকেরা নেহায়েতই কাম-ক্ষুধা ও সৌন্দর্যের পুজারী– যাহা চতুষ্পদ প্রাণীদের মধ্যেও বিদ্যমান। আর নিছক পার্থিব ভোগ-বিলাসের সঙ্গেই তাহাদের পরিচয় এবং আরেফগণের জগৎ সম্পর্কে তাহাদের কিছুমাত্র ধারণা নাই।

সুতরাং আরেফগণ যেই স্বাদ ও লজ্জত পাইয়াছেন তাহা এমন লোকদের সম্মুখে বর্ণনা করা হারাম– যাহারা উহার আহাল বা উপযুক্ত নহে। আর যাহারা উহার আহাল তাহাদিগকে উহা বয়ান করিয়া বুঝাইতে হয় না, তাহারা বরং নিজে নিজেই উহা উপলব্ধি করিতে পারেন।

খওফের ফজীলত এবং উহার প্রতি উৎসাহ

খওফের ফজীলত প্রথমতঃ যুক্তি ও কেয়াসের মাধ্যমে এবং দ্বিতীয়তঃ কোরআন ও হাদীসের মাধ্যমে জানা যাইবে। যুক্তি ও কেয়াস এই যে, পারলৌকিক সাফল্যই হইল মানুষের যথার্থ ও চূড়ান্ত সাফল্য। সুতরাং মানুষের এই পারলৌকিক সাফল্য তথা আল্লাহ পাকের দীদার লাভের পথে যেই বস্তু মানুষকে যেই পরিমাণ সাহায্য করিবে, উহার ফজীলতও সেই পরিমাণই সাব্যস্ত হইবে।

আমরা সকলেই জানি, দুনিয়াতে আল্লাহর মোহাব্বত অর্জন করা ব্যতীত পরকালে তাঁহার দীদার লাভ করা সম্ভব হইবে না। আল্লাহর মা'রেফাত এবং তাঁহার পরিচয় না জানিলে এই মোহাব্বত পয়দা হয় না। আর সর্বদা আল্লাহর জিকির ও ফিকির ব্যতীত এই মা'রেফাত হাসিল হয় না। এদিকে "হোবেব

দুনিয়া” তথা দুনিয়ার মোহাব্বত ত্যাগ না করিলে যেমন সর্বদা আল্লাহর জিকির ও স্মরণে মশগুল থাকা সম্ভব হয় না, অনুরূপভাবে পার্থিব কামনা-বাসনা ত্যাগ না করিলে দুনিয়ার মোহাব্বতও বর্জন করা সম্ভব হয় না। এই কামনা-বাসনা খওফের আগুন দ্বারা যতটুকু দূর করা সম্ভব হয় অন্য কিছু দ্বারা এতটুকু সম্ভব হয় না। অর্থাৎ, খওফ এমন এক আগুন যাহা মানুষের কাম-প্রবৃত্তিকে জ্বালাইয়া-পোড়াইয়া ভস্ম করিয়া দেয়।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, মানুষের অন্তর হইতে কাম প্রবৃত্তি দূরীভূত করা, গোনাহ হইতে হেফাজত করা এবং আল্লাহর এবাদত ও আনুগত্যের পথে এই খওফ যেই পরিমাণ ভূমিকা রাখিবে, উহার ফজীলতও সেই পরিমাণই সাব্যস্ত হইবে। ইতিপূর্বে আমরা আলোচনা করিয়াছি, এই খওফের প্রকারভেদে ইহার স্তরও বিভিন্ন হইয়া থাকে।

ইফ্‌ফত, ওরা, তাকওয়া ও মোজাহাদা ইত্যাদি বিষয় দ্বারা আল্লাহর নৈকট্য অর্জিত হয় আর এই সকল বিষয় অর্জিত হয় খওফ দ্বারা। সুতরাং এই খওফ উত্তম ও ফজীলতপূর্ণ হওয়াই কেয়াস ও যুক্তির দাবী।

পবিত্র কোরআন ও হাদীসে পাকের বিভিন্ন স্থানে খওফের ফজীলত উল্লেখ করা হইয়াছে। হেদায়েত, রহমত, এলেম ও রিজা জান্নাতীদের এই চারিটি মোকামকে কোরআনের তিনটি আয়াতে খওফকারীদের জন্য নির্দিষ্ট করিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। হেদায়েত ও রহমতের কথা উল্লেখ করিয়া এরশাদ হইয়াছে–

هُدًى وَّ رَحْمَةً لِلَّذِيْ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُوْنَ *

অর্থাৎ– হেদায়েত ও রহমত তাহাদের জন্য, যাহারা তাহাদের পালনকর্তাকে ভয় করে।

এলেম সম্পর্কে বলা হইয়াছে–

اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

অর্থাৎ– বান্দাদের মধ্যে কেবল আলেমগণ আল্লাহকে ভয় করে।

রিজার কথা বিবৃত হইয়াছে এইভাবে–

رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ ذٰلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهٗ

অর্থাৎ– আল্লাহ তাহাদের প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছেন এবং তাহারা আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হইয়াছে। ইহা সেই ব্যক্তির জন্য, যে তাহার রবকে ভয় করে।

এতদ্‌ব্যতীত এলেমের ফজীলত সম্পর্কে যাহা কিছু বলা হইয়াছে উহা দ্বারা খওফের ফজীলতও প্রমাণিত হয়। কারণ, খওফ এলেমেরই ফল। এই কারণেই হযরত মুসা (আঃ)-এর হাদীসে বলা হইয়াছে, খওফকারীগণ ‘রফীকে আলা’ তথা মহান সঙ্গীর সাহচর্য লাভ করিবে এবং এই ক্ষেত্রে অপর কেহ তাহাদের সহিত সম্পৃক্ত হইবে না। এই সাহচর্য বিশেষভাবে তাহাদের জন্য নির্দিষ্ট হওয়ার কারণ এই যে, খওফকারীগণ আলেম হইয়া থাকেন। আলেমগণ নবীগণের ওয়ারিশ হওয়ার সোবাদে তাঁহারা আম্বিয়া (আঃ)-এর সাহচর্য লাভ করিবেন। আর নবী ও তাঁহাদের সহিত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ “রফীকে আলা” তথা আল্লাহর সঙ্গ লাভ করিবেন। এই কারণেই অন্তিম পীড়ায় যখন পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এই এখতিয়ার দেওয়া হইল যে, আপনি দুনিয়াতে অবস্থান করুন কিংবা আল্লাহর নিকট চলিয়া আসুন; তখন তিনি ফরমাইলেন–

اسئلك الرفيق الاعلى

– আমি “রফীকে আ’লা”কে চাই।

মূল খওফের দিকে যদি নজর করা হয় তবে স্পষ্ট জানা যাইবে যে, এই অবস্থাটি হইতেছে এলেম, আর খওফের ফলাফলের দিকে নজর করিলে দেখা যাইবে উহা ‘ওরা’ ও ‘তাকওয়া’। ওরা ও তাকওয়ার ফজীলত সম্পর্কে যাহা বলা হইয়াছে, উহা সুস্পষ্ট। এমনকি উহার পরিণামফলও তাকওয়ার জন্যই নির্দিষ্ট বলিয়া সাব্যস্ত হইয়াছে। যেমন ‘হামদ’ বিশেষভাবে আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট এবং দুরূদ নির্দিষ্ট রাসূলুল্লাহ ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য। অনুরূপভাবে পরিণাম ও তাকওয়ার খুসুসিয়াত ও বৈশিষ্ট্য বলিয়া সাব্যস্ত। যেমন বলা হয়–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ الْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَّ اٰلِهٖ اَجْمَعِيْنَ *

অর্থাৎ– সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য। পরিণামফল মোত্তাকীনদের জন্য এবং দুরূদ মোহাম্মদ (ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) এবং তাঁহার আল-আওলাদের জন্য।

আল্লাহ তায়ালা তাকওয়াকে নিজের পবিত্র জাতের জন্য নির্দিষ্ট করিয়াছেন। যেমন এরশাদ হইয়াছে–

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَ لَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ

অর্থাৎ– উহাদের গোশত ও রক্ত আল্লাহর নিকট পৌছায় না। কিন্তু

তোমাদের তাকওয়া তাঁহার নিকট পৌছে।

তাকওয়ার অর্থ ইতিপূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে যে, খওফের কারণে গোনাহ হইতে বিরত থাকা এবং এই কারণেই উহার মাহাত্ম্য। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ

অর্থাৎ– আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি আকরাম বা অধিক সম্মানিত, যেই ব্যক্তি গোনাহ হইতে অধিক বাঁচিয়া থাকে।

এই কারণেই আল্লাহ পাক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে তাকওয়া অবলম্বনের নির্দেশ দিয়া এরশাদ করিয়াছেন–

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِيْنَ أُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللّٰهَ

অর্থাৎ– বস্তুতঃ আমি নির্দেশ দিয়াছি তোমাদের পূর্ববর্তী গ্রন্থের অধিকারীদিগকে এবং তোমাদিগকে যে, তোমরা সকলে ভয় করিতে থাক আল্লাহকে।

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

وَخَافُوْنِ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ *

অর্থাৎ– তোমরা আমাকে ভয় কর যদি তোমরা মোমেন হও।

উপরোক্ত আয়াতে নির্দেশসূচক পদ ব্যবহার করিয়া খওফ করার হুকুম করা হইয়াছে এবং উহার সঙ্গে ঈমানের শর্ত জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং কোন মোমেনের পক্ষেই খওফ হইতে পৃথক থাকা কল্পনা করা যায় না। প্রত্যেক মোমেনের মধ্যে খওফ কম-বেশী থাকিবেই। মানুষ আল্লাহর মা'রেফাত ও ঈমানের মধ্যে যেই পরিমাণ দুর্বল হইবে, তাহার খওফও সেই পরিমাণই দুর্বল হইবে।

তাকওয়ার ফজীলত প্রসঙ্গে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন– যখন আল্লাহ পাক পূর্ববর্তী ও পরবর্তী সকলকে একত্রিত করিবেন, তখন হঠাৎ এমন একটি আওয়াজ আসিবে যাহা নিকটে অবস্থানকারী ও দূরে অবস্থানকারী সকলে এক রকম শুনিতে পাইবে। বলা হইবে, আমি তোমাদিগকে যেই দিন পয়দা করিয়াছি সেই দিন হইতে আজ পর্যন্ত আমি নীরব ছিলাম। আজ তোমরা নীরব থাক, তোমাদের আমল তোমাদের সম্মুখে আসিতেছে। হে লোকসকল! আমি একটি নসব নির্ধারণ করিয়াছিলাম। কিন্তু

তোমরা অন্য নসব নির্ধারণ করিয়া আমার নসবকে হীন মনে করিলে এবং তোমাদের নিজেদের নসবকে উত্তম মনে করিলে। অথচ আমি তো বলিয়াছিলাম–

إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ أَتْقَاكُمْ

অর্থাৎ– আল্লাহর নিকট তোমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি অধিক সম্মানিত, যে গোনাহ হইতে অধিক বাঁচিয়া থাকে। কিন্তু তোমরা তাহা মানিলে না এবং বলিলে, অমুকের বেটা অমুক উত্তম। আজ আমি তোমাদের নসব নীচু করিয়া আমার নসবকে উঁচা করিব। মোত্তাকী লোকেরা কোথায়? এমন সময় তাহাদের ঝাণ্ডা উঁচু হইবে এবং সকলে উহার সঙ্গে জান্নাতে নিজেদের আবাসে চলিয়া যাইবে।

অপর এক হাদীসে আছে–

الحكمة مخافة الله

অর্থাৎ– হেকমত তথা প্রজ্ঞা ও জ্ঞানের মূল হইল আল্লাহর ভয়।

আঁ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা হযরত ইবনে মাসউদ (রাঃ)-কে বলিলেন, তুমি যদি ইহা কামনা কর যে, আমার সঙ্গে মিলিত হইবে, তবে আমার পরে আল্লাহকে খুব ভয় করিবে।

হযরত ফোজায়েল (রহঃ) বলেন, কেহ যদি আল্লাহকে খওফ করে, তবে এই খওফ তাহার সামনে সকল প্রকার ভালাই ও কল্যাণের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দেয়।

খওফ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত শিবলী (রহঃ) বলেন, যখন আমি আল্লাহকে ভয় করি, তখন আমার সম্মুখে হেকমত শিক্ষা গ্রহণের এমন এক দ্বার উন্মোচিত হইয়া যায়, যাহা আমি আর কখনো দেখি নাই। হযরত ইয়াহ্ইয়া বিন মোয়াজ বলেন, কোন মোমেন যখন কোন অপরাধ করে, তখন উহার পিছনে দুইটি নেকী থাকে। একটি হইল সেই গোনাহের কারণে আজাবের খওফ এবং অপরটি আল্লাহ পাকের নিকট ঐ গোনাহ হইতে ক্ষমা পাওয়ার আশা। অর্থাৎ, তাহার অপরাধটি খওফ ও রিজার মাঝখানে এমনভাবে অবস্থান করে যেমন দুইটি ব্যাঘ্রের মাঝখানে শৃগালের অবস্থান।

হযরত মূসা (আঃ)-এর হাদীসে আছে, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক এরশাদ ফরমাইবেন, এমন কোন ব্যক্তি নাই, আমি যাহাদের হিসাব গ্রহণ করিব না। কিন্তু ওরা ও তাকওয়াওয়ালাগণকে হিসাবের জন্য দাঁড় করাইতে আমি

লজ্জাবোধ করি। কেননা, তাহাদের মর্যাদা ইহার উর্ধ্বে। ওরা ও তাকওয়া এমন দুইট শব্দ যে, উহার সঙ্গে খওফ শর্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অর্থাৎ, উহার সঙ্গে খওফ অবশ্যই বিদ্যমান থাকিবে এবং খওফ না থাকিলে ওরা ও তাকওয়াও থাকিবে না।

আল্লাহ পাক পবিত্র কোরআনে ফজীলতের কতক আয়াতকে খওফকারীদের জন্য খাস করিয়া দিয়াছেন। যেমন এরশাদ হইয়াছে–

سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَّخْشٰى

অর্থাৎ– যে ভয় করে, সে উপদেশ গ্রহণ করিবে।

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ جَنَّتَانِ

অর্থাৎ– যেই ব্যক্তি তাহার পালনকর্তার সামনে পেশ হওয়ার ভয় রাখে, তাহার জন্য রহিয়াছে দুইটি জান্নাত।

হাদীসে কুদসীতে আছে, আল্লাহ পাক এরশাদ করেন– আমার ইজ্জত ও জালালের কসম, আমার বান্দার উপর আমি দুইটি খওফ একত্রিত করিব না এবং দুইটি শান্তিও একত্রিত করিব না। বান্দা যদি দুনিয়াতে আমা হইতে খওফশূন্য থাকে, তবে কেয়ামতে আমি তাহাকে খওফ প্রদর্শন করিব। আর দুনিয়াতে যদি সে আমাকে খওফ করে তবে কেয়ামতে তাহাকে খওফ শূন্যতা দান করিব।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

من خاف الله تعالى خاف منه كل شيء و من خاف غير الله خوفه

الله من كل شيء

অর্থ ঃ যেই ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, সকল বস্তু তাহাকে ভয় করে। আর যেই ব্যক্তি গায়রুল্লাহকে (অর্থাৎ আল্লাহ ব্যতীত অন্য বস্তুকে) ভয় করে, আল্লাহ তাহাকে সকল বস্তু হইতে ভয় দেখান।

হযরত ইয়াহইয়া বিন মোয়াজ বলেন, মানুষ দারিদ্র্যকে যেই পরিমাণ ভয় করে, যদি জাহান্নামের আগুনকেও সেই পরিমাণ ভয় করিত, তবে সে জান্নাতে প্রবেশ করিতে পারিত। প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত জুন্নুন (রহঃ) বলেন, মানুষ যখন আল্লাহকে ভয় করে, তখন তাহার দিল নরম হইয়া যায়। এই পর্যায়ে আল্লাহর

সঙ্গে তাহার মোহাব্বত দৃঢ় হয় এবং বুদ্ধি-বিবেচনা স্থিরতা লাভ করে। তিনি আরো বলিয়াছেন, রিজার তুলনায় খওফ অধিক হওয়া উত্তম। কারণ, রিজা গালেব ও প্রবল হওয়ার পর মানুষের দিল পেরেশান হইয়া যায়।

হযরত আবুল হোছাইন নাবিনা বলিতেন, সৌভাগ্যের আলামত হইল দুর্গতিকে ভয় করা। কারণ, ভয় হইল আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার একটি লাগাম। বান্দা যখন এই লাগাম হইতে বঞ্চিত হয়, তখন সে ধ্বংস হইয়া যায়। হযরত সহল তশতরী (রহঃ) বলেন, মানুষের খাবার যতদিন হালাল না হইবে ততদিন তাহার খওফ অর্জিত হইবে না।

হযরত আবু সুলাইমান দারানী বলেন, যেই অন্তর খওফশূন্য হয়, উহা বিনষ্ট হইয়া যায়। হযরত হাছান (রহঃ)-এর নিকট কতক লোক আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, হযরত! আমরা এমন লোকদের সঙ্গে বসি, যাহারা আমাদিগকে এমন ভীতি প্রদর্শন করে যে, উহার ফলে আমাদের অন্তর যেন অস্থির হইয়া উড়িয়া যায়। এখন আমরা উহার কি প্রতিকার করিব? জবাবে তিনি ফরমাইলেন, যাহারা মানুষের অন্তরকে নির্ভয় করিয়া দেয়, তাহাদের তুলনায় এমন লোকদের নিকট উপবেশন করা উত্তম, যাহারা এই পর্যায়ের ভীতি প্রদর্শন করে যে, উহার ফলে মন এতমিনান ও প্রশান্ত হইয়া যায়। আর খওফ একবারই অন্তরকে পীড়ণ করে।

হযরত আয়েশা (রাঃ) একদা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! و يؤتون ما اتو و قلوبهم وجلة আয়াতের উদ্দিষ্ট কি সেই সকল ব্যক্তি, যাহারা চুরি করে কিংবা ব্যভিচার করে? জবাবে তিনি এরশাদ ফরমাইলেন, না, (এই আয়াতের উদ্দিষ্ট) বরং সেই সকল ব্যক্তি, যাহারা নামাজ-রোজা আদায় করে, ছদকাহ প্রদান করে এবং প্রত্যাখ্যাত হওয়ার ভয় করে।

আল্লাহ পাকের আজাব হইতে বেখওফ হওয়া প্রসঙ্গে যেই শাস্তি ও নিন্দাবাণী বর্ণিত আছে, প্রকারান্তরে সেইগুলিও খওফের ফজীলত জ্ঞাপন করে। কারণ, কোন বিষয়ের নিন্দা করা হইলে উহার বিপরীত বিষয়ের প্রশংসাই প্রমাণিত হয়। সুতরাং খওফের বিপরীত হইল আমান ও শান্তি এবং নৈরাশ্যের বিপরীত হইল রিজা বা আশার আলো। সেমতে নৈরাশ্যের নিন্দা দ্বারা আশার ফজীলত এবং আমান ও ভয় শূন্যতার নিন্দা দ্বারা খওফের ফজীলত প্রমাণিত হয়। বরং আমরা তো বলি, রিজার ফজীলত প্রসঙ্গে যাহাকিছু বিবৃত হইয়াছে উহা দ্বারা খওফের ফজীলতই প্রমাণিত হয়। কারণ রিজা ও খওফ একটি

অপরটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। উহার কারণ এই যে, কোন ব্যক্তি যদি কোন প্রিয় বস্তু পাওয়ার প্রত্যাশা করে, তবে সেই ক্ষেত্রে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহার অন্তরে উহা না পাওয়ার ভয়ও বিদ্যমান থাকিবে। অর্থাৎ, তাহার অন্তরে যদি এই ভয় না থাকে তবে ঐ বস্তুটি তাহার প্রিয় বলিয়া মনে করা হইবে না এবং উহার প্রত্যাশাও সে করিবে না।

মোটকথা, খওফ ও রিজা একটি অপরটির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত এবং একটি অপরটি হইতে পৃথক হওয়ার কোন উপায় নাই। অবশ্য এই রিজা ও খওফ একত্রিত হওয়ার ক্ষেত্রে একটি অপরটির উপর প্রবল হইতে পারে এবং ইহাও সম্ভব যে, একটির প্রতি মন অতিরিক্ত আকৃষ্ট হওয়ার কারণে অপরটির প্রতি মনোযোগ হ্রাস পাইবে।

খওফ ও রিজা একটি অপরটির সঙ্গে যুক্ত হওয়ার ক্ষেত্রে শর্ত হইল, যেই বিষয়ে রিজা বা খওফ করা হইতেছে সেই বিষয়টি সন্দেহযুক্ত হইতে হইবে। অর্থাৎ, কোন নিশ্চিত বিষয়ের উপর খওফ বা রিজা কিছুই করা হয় না। এক্ষণে মনে কর, সেই বিষয়টি যদি প্রিয় হয় এবং লাভ করার 'সম্ভাবনা' থাকে, তবে সেই ক্ষেত্রে তো উহা না পাওয়ারও সম্ভাবনা থাকিবে। সুতরাং যদি মনে করা হয় যে কোন প্রিয় বস্তু প্রাপ্ত হইবে তবে এই ক্ষেত্রে অন্তরে সুখ অনুভব হইবে এবং ইহারই নাম রিজা। পক্ষান্তরে যদি মনে করা হয় যে, ঐ বস্তুটি লাভ করা যাইবে না, তবে এই ক্ষেত্রে অন্তরে ছদমা ও দুঃখ অনুভব হইবে এবং ইহাই খওফ।

বলাবাহুল্য, বর্ণিত উভয় ছুরতে একটি অপরটির বিপরীত হওয়ার জন্য শর্ত হইল অভীষ্ট বিষয়টি সন্দেহযুক্ত হইতে হইবে। আর অভীষ্ট বিষয়টি বাস্তবায়ন হওয়া বা না হওয়ার উভয় সম্ভাবনাই যখন সন্দেহযুক্ত হয়, সেই ক্ষেত্রে অনেক সময় কোন একটি সম্ভাবনা হয়ত বিশেষ কোন কারণে অপরটির উপর প্রাধান্য লাভ করে। এই বিশেষ কারণটি হইল 'যন্' বা ধারণা। এই ধারণার কারণেই খওফ ও রিজা একটি অপরটির উপর প্রাধান্য লাভ করে। অর্থাৎ, অভীষ্ট প্রিয় বিষয়টি লাভ করার ধারণা যদি গালেব ও প্রবল হয় তবে রিজা শক্তিশালী হইয়া খওফের উপর প্রাধান্য লাভ করে। অনুরূপভাবে সেই প্রিয় বিষয়টি না পাওয়ার ধারণা যদি প্রবল হয়, তবে এই ক্ষেত্রে খওফ প্রবল হইয়া রিজা শক্তিহীন হইয়া পড়ে। অর্থাৎ এইভাবেই আলোচ্য অবস্থায় খওফ ও রিজা একটি অপরটির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া যায়। খওফ ও রিজার এই পারস্পরিক সংশ্লিষ্টতার কারণেই আল্লাহ পাক উভয়টিকে একত্রে এরশাদ ফরমাইয়াছেন। যেমন বলা হইয়াছে–

يَدْعُوْنَنَا رَغَبًا وَّ رَهَبًا

অর্থাৎ– তাহারা আমাকে আশা ও ভয়সহ ডাকে।

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا

অর্থাৎ– তাহারা নিজেদের রবকে ভয় ও আশাসহ ডাকে।

পবিত্র কোরআনের বিভিন্ন স্থানে রিজা খওফের অর্থে ব্যবহার হইয়াছে। উহার কারণও ইহাই যে, এই দুইটি বিষয় পরস্পর অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত। আরবদের একটি নিয়ম হইল, অনেক ক্ষেত্রে তাহারা এক শব্দ বলিয়া অন্য অর্থ গ্রহণ করিয়া থাকে। সুতরাং আমরাও বলিয়া থাকি– খওফের কারণে কান্না করা ইহা দ্বারাও খওফেরই মাহাত্ম্য প্রকাশ পায়। কারণ খওফের ফলশ্রুতিতেই কান্না আসিয়া থাকে। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلاً وَ لِيَبْكُوا كَثِيْرًا

অর্থাৎ– সুতরাং তাহারা যেন সামান্য হাসে এবং তাহারা তাহাদের কৃতকর্মের বদলাতে অনেক বেশী কাঁদিবে।

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

وَ يَخِرُّوْنَ لِلْاَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَ يَزِيْدُهُمْ خُشُوْعًا

অর্থাৎ– তাহারা ক্রন্দন করিতে করিতে নত মস্তকে ভূমিতে লুটাইয়া পড়ে এবং তাহাদের বিনয়ভাব আরো বৃদ্ধি পায়।

আলোচ্য প্রসঙ্গে সূরা আননাজমে এরশাদ হইয়াছে–

اَ فَمِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ تَعْجَبُوْنَ وَ تَضْحَكُوْنَ وَ لَا تَبْكُوْنَ، وَ اَنْتُمْ سَامِدُوْنَ *

অর্থাৎ– তোমরা কি এই বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করিতেছ? এবং হাসিতেছ– ক্রন্দন করিতেছ না? তোমরা ক্রিড়া-কৌতুক করিতেছ।

আল্লাহর ভয়ে ক্রন্দন

হাদীসে পাকে কান্নার ফজীলত সম্পর্কে বহু আলোচনা আসিয়াছে। আঁ হযরত ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, এমন কোন ঈমানদার বান্দা নাই যাহার চক্ষু হইতে সামান্য অশ্রুও বাহির হইয়া চেহারায় গড়াইয়া পড়িবে, আর আল্লাহ পাক তাহার উপর দোজখের আগুন হারাম করিয়া দিবেন না।

অন্য হাদীসে আছে, আল্লাহর ভয়ে যখন ঈমানদার বান্দার অন্তর কাঁপিয়া উঠে, তখন বৃক্ষের পাতার মত তাহার গোনাহসমূহ ঝড়িয়া পড়ে।

একদা হযরত ওকবা বিন আমের পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া আরজ করিলেন, হে আল্লাহর রাসূল! নাজাত পাওয়ার উপায় কি? জবাবে তিনি এরশাদ ফরমাইলেন, নিজের জবানকে সংযত রাখ, ঘর হইতে বাহির হইও না এবং নিজের গোনাহের জন্য ক্রন্দন কর।

একদা হযরত আয়েশা (রাঃ) রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে আরজ করিলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার উম্মতের মধ্যে কেহ বিনা হিসাবে জান্নাতে যাইবে কি? এরশাদ হইল, যেই ব্যক্তি নিজের গোনাহের কথা স্মরণ করিয়া ক্রন্দন করিবে, সেই ব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে যাইবে।

অন্য হাদীসে আছে– আল্লাহ পাকের নিকট দুইটি বিন্দুর চেয়ে উত্তম অপর কোন বিন্দু নাই। একটি হইল অশ্রু বিন্দু, যাহা আল্লাহর ভয়ে নির্গত হয় এবং অপরটি রক্ত বিন্দু, যাহা আল্লাহর পথে জেহাদ করার সময় দেহ হইতে বাহির হয়।

রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, কেয়ামতের দিন আল্লাহ পাক সাত ব্যক্তিকে ছায়া দান করিবেন, যেই দিন তাঁহার ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকিবে না। তাহাদের মধ্যে একজন হইবে সেই ব্যক্তি, যে নির্জনে আল্লাহকে স্মরণ করিয়া কাঁদে।

হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ) বলেন, যেই ব্যক্তি কাঁদিতে পারে সে যেন কাঁদে। আর যেই ব্যক্তি কাঁদিতে পারে না, সে যেন কান্নার ভান করে। হযরত মোহাম্মদ বিন মুনকাদির যখন ক্রন্দন করিতেন, তখন চোখের পানি চেহারা ও দাড়িতে মুছিয়া লইতেন। তিনি বলিতেন, আমি জানিতে পারিয়াছি যে, যেই জায়গায় চোখের পানি লাগিবে দোজখের আগুন সেই জায়গা স্পর্শ করিবে না।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর (রাঃ) বলেন, তোমরা ক্রন্দন কর, যদি ক্রন্দন না আসে তবে অন্ততঃ উহার ভান কর। তোমরা যদি ইহার হাকীকত অবগত হইতে, তবে এমনভাবে চিৎকার করিতে যে, তোমাদের শ্বাস রুদ্ধ হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইত।

হযরত আবু সুলাইমান দারানী (রহঃ) বলেন, কাহারো চোখ যদি অশ্রুতে পূর্ণ হইয়া যায়, তবে কেয়ামতের দিন তাহার চেহারা অপমানিত হইবে না। আর চোখের অশ্রু যদি গড়াইয়া পড়ে, তবে উহার প্রথম বিন্দু দ্বারাই বহু অগ্নিসমূদ্র শীতল হইয়া যাইবে। অনুরূপভাবে কোন ব্যক্তি যদি কোন জামায়াতের সঙ্গে ক্রন্দন করে তবে সেই জামায়াতের লোকদের কোন আজাব হইবে না। তিনি আরো বলিয়াছেন, কান্না আসে খওফের কারণে এবং রিজা হয় শওকের কারণে।

হযরত কা'ব আহ্বার বলেন, আল্লাহর শপথ! আমি একটি স্বর্ণের পাহাড় দান করিয়া দেওয়া অপেক্ষা উত্তম মনে করিব আল্লাহর ভয়ে এমনভাবে ক্রন্দন করাকে যেন চোখের পানি আমার চেহারাতে গড়াইয়া পড়ে।

হযরত হানজালা (রাঃ) বলেন, একবার আমরা রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত ছিলাম। এই সময় তিনি আমাদিগকে এমন কিছু নসীহত করিলেন যে, উহার ফলে আমাদের অন্তর নরম হইয়া চোখ হইতে অশ্রু প্রবাহিত হইতে লাগিল। কিন্তু পরে আমি যখন ঘরে ফিরিয়া আসিয়া পরিবার-পরিজনের সঙ্গে সাংসারিক কথাবার্তায় লিপ্ত হইলাম, তখন আমার মন হইতে ইতিপূর্বের হালাত দূর হইয়া আমি দুনিয়ার সঙ্গে জড়াইয়া পড়িলাম এবং রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে যেই উপদেশ শুনিয়াছিলাম সেই সকল কথা একেবারেই ভুলিয়া গেলাম। কিন্তু পরে আবার উহা স্মরণ হইতেই আমি মনে মনে বলিলাম, আমি তো মোনাফেক হইয়া গিয়াছি। কারণ, ইতিপূর্বে আমার অন্তরে যেই ভয় ও বিনম্রভাব পয়দা হইয়াছিল, এখন তো উহা পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে।

অর্থাৎ, আমার মনের উপরোক্ত ধারণা সৃষ্টি হওয়ার পরই ঘর হইতে বাহির হইয়া চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিলাম, হানজালা মোনাফেক হইয়া গিয়াছে! হানজালা মোনাফেক হইয়া গিয়াছে!! এই সময় পথিমধ্যে হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাঃ)-এর সঙ্গে সাক্ষাত হইলে তিনি আমাকে বলিলেন, হানজালা কখনো মোনাফেক হয় নাই। পরে আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে হাজির হইয়া সেই আগের মতই বলিতেছিলাম যে,

হানজালা মোনাফেক হইয়া গিয়াছে! আমার এই কথা শুনিয়া তিনি ফরমাইলেন, তুমি মোটেও মোনাফেক হও নাই। আমি সবিনয়ে আরজ করিলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি যখন আপনার খেদমতে হাজির ছিলাম তখন আপনার নসীহত শুনিয়া আমার অন্তরে এমন ভয় পয়দা হইল যে, চোখ হইতে অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। কিন্তু ঘরে ফিরিয়া আসিয়া সংসারের কাজে লিপ্ত হওয়ার পর আমি আগের সকল কথা ভুলিয়া গেলাম। ইহা কি মোনাফেকের আলামত নহে?

পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইলেন, হানজালা! তোমার অন্তরে যদি সর্বদা এই অবস্থা বিরাজ করে, তবে ফেরেশতাগণ পথিমধ্যে ও শয্যায় তোমার সঙ্গে মোসাফাহা করিবে। তবে সকল জিনিসেরই একটা সময় আছে।

সারকথা হইল– রিজা, রোনাজারী, তাক্ওয়া, ওরা ও এলেমের ফজীলত বর্ণনায় যাহাকিছু বলা হইবে, উহা দ্বারা খওফের ফজীলতই প্রমাণিত হইবে। কারণ, এই বিষয়গুলি খওফের সহিত সম্পৃক্ত।

রিজা ও খওফের প্রাবল্যের মধ্যে উত্তম কোন্টি?

উপরের সুদীর্ঘ আলোচনায় আমরা দেখিতে পাইয়াছি, রিজা ও খাওফের ফজীলত বর্ণনায় অসংখ্য বিবরণ আসিয়াছে। সুতরাং পাঠকের মনে এমন প্রশ্ন দেখা দিতে পারে যে, রিজা ও খওফের মধ্যে উত্তম কোন্টি? আসলে এই ধরনের প্রশ্ন নিরর্থ। কারণ, উহার ধরণ যেন এইরূপ– যেমন কেহ প্রশ্ন করিল, রুটি উত্তম, না পানি উত্তম। এই প্রশ্নের জবাবে তো ইহাই বলা হইবে যে, যাহার ক্ষুধা লাগিয়াছে তাহার জন্য রুটি উত্তম, আর যেই ব্যক্তির পানির পিপাসা পাইয়াছে তাহার জন্য পানি উত্তম। অবশ্য ক্ষুধা ও পিপাসা এই উভয় প্রয়োজন যদি একই সঙ্গে দেখা দেয়, তবে উহার মধ্যে যেইটি প্রবল হইবে উহাই ধর্তব্য হইবে। অর্থাৎ ক্ষুধা প্রবল হইলে রুটি উত্তম হইবে এবং পিপাসা প্রবল হইলে পানি উত্তম বলিয়া বিবেচিত হইবে। পক্ষান্তরে উভয় প্রয়োজনই যদি বরাবর হয় তবে রুটি ও পানির চাহিদাও বরাবর হইবে। উহার কারণ এই যে, মানুষ যখন কোন প্রয়োজনে কোন বস্তু কামনা করে, তখন সেই প্রয়োজন অনুসারেই ঐ বস্তুটির মূল্যায়ন হয়। অর্থাৎ বস্তুটি উহার নিজস্ব সত্তায় কতটুকু মূল্যবান এই কথা বিবেচনা করা হয় না; বরং ঐ বস্তু দ্বারা তাহার প্রয়োজন কি পরিমাণ সমাধা হইবে, এই মানদণ্ড দ্বারাই প্রার্থিত বস্তুর মূল্যায়ন হইয়া থাকে।

খওফ ও রিজা যেহেতু মানুষের আধ্যাত্মিক রোগের চিকিৎসাবিশেষ; সুতরাং এই ক্ষেত্রে মানুষের অন্তরে সংশ্লিষ্ট ব্যাধি যেই পরিমাণ বিদ্যমান থাকিবে, উহার চিকিৎসার উপকরণটিও সেই পরিমাণই গুরুত্ব লাভ করিবে। তো মানুষের অন্তর যদি আল্লাহর আজাব ও গজবের খওফ হইতে নির্ভয় হওয়ার ব্যাধিতে আক্রান্ত থাকে তবে এই ক্ষেত্রে খওফ উত্তম চিকিৎসা বলিয়া সাব্যস্ত হইবে। পক্ষান্তরে যদি নৈরাশ্য প্রবল থাকে তবে রিজা উত্তম হইবে। মানুষের উপর যদি গোনাহ প্রবল হয় তবে সেই ক্ষেত্রেও খওফ উত্তম হইবে। তাছাড়া খওফকে সর্বাবস্থায়ও উত্তম বলা যাইবে। যেমন, এইরূপ বলা সঠিক হইবে যে, রুটি সিকন্জ্বীন (অম্লরস ও মধু সহযোগে প্রস্তুত তরল উপকরণ) অপেক্ষা উত্তম। কারণ রুটি দ্বারা মানুষের ক্ষুধা নিবারণ হয়, আর সিক জ্বীন দ্বারা নিবারণ হয় পিত্তদোষ। মানুষের মধ্যে যেহেতু ক্ষুধার ব্যাধিটি স্থায়ী ও ব্যাপক, সুতরাং রুটির চাহিদা ও প্রয়োজনও অধিক। অতএব, সিকন্জ্বীন অপেক্ষা রুটিকেই উত্তম বলিতে হইবে।

উপরের পর্যালোচনার আলোকে 'গালাবায়ে খাওফ' তথা খওফের প্রাবল্যকেই উত্তম বলিতে হইবে। কারণ গোনাহে লিপ্ত হওয়ার ব্যাধিটি মানুষের মাঝে ব্যাপক। কিন্তু খওফ ও রিজার উৎসের প্রতি লক্ষ্য করিলে রিজাকে উত্তম বলিতে হয়। কারণ, রিজার উৎস হইল রহমতের দরিয়া এবং খওফের উৎস হইল গজবের দরিয়া।

যেই ব্যক্তি জাহেরী ও বাতেনী তথা প্রকাশ্য ও গোপন সর্বপ্রকার গোনাহ ত্যাগ করিয়াছে, তাহার পক্ষে উত্তম হইল খওফ ও রিজা সমান সমান রাখা। এই প্রসঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ কওল হইল– যদি মোমেনের খওফ ও রিজা পরিমাপ করা হয়, তবে উভয়টি সমান সমান হইবে।

একদা হযরত আলী (রাঃ) নিজের ছেলেকে বলিলেন, বেটা! আল্লাহকে এইরূপ ভয় করিবেঃ মনে কর, তুমি যদি পৃথিবীর সকল মানুষের নেক আমল লইয়া তাঁহার নিকট হাজির হও, তবুও তিনি সেইগুলি কবুল করিবেন না। অনুরূপভাবে তাঁহার নিকট আশাও এইরূপ পোষণ করিবেঃ মনে কর, তুমি যদি গোটা পৃথিবীর সকল মানুষের গোনাহের বোঝা লইয়া তাঁহার নিকট হাজির হও, তবে সেই ক্ষেত্রেও আল্লাহ পাক তোমাকে ক্ষমা করিয়া দিবেন।

হযরত ওমর (রাঃ) বলেন, আল্লাহ পাকের পক্ষ হইতে যদি এই ঘোষণা দেওয়া হয় যে, মাত্র একজন ব্যতীত অপর সকলে দোজখে যাইবে, তবে এই ক্ষেত্রে আমি এইরূপ আশা পোষণ করিব যে, সেই একমাত্র ব্যক্তিটি হয়ত

আমিই হইব। পক্ষান্তরে যদি এই ঘোষণা দেওয়া হয় যে, মাত্র একজন ব্যতীত অপর সকলে জান্নাতে যাইবে তবে সেই ক্ষেত্রেও আমি এমন খওফ করিব যে, সেই একমাত্র ব্যক্তিটি আমিই হই কিনা। ইহা হইল খওফ ও রিজার চূড়ান্ত পর্যায়। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে খওফ ও রিজার প্রাবল্য সত্ত্বেও উহাতে ভারসাম্য রক্ষা হইয়াছে।

কিন্তু কোন গোনাহ্‌গার ব্যক্তি যদি এমন ধারণা করে যে, সে দোজখে যাইবে না বরং দোজখ হইতে বাঁচিয়া যাওয়া লোকদের মধ্যেই গণ্য হইবে, তবে ইহা রিজা নহে, ইহা বরং প্রতারিত হওয়ারই একটি পথ বটে।

এক্ষণে হয়ত এমন প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, হযরত ওমরের মত মহান ব্যক্তির মধ্যে খওফ ও রিজা বরাবর হওয়া ঠিক নহে। বরং তাঁহার মধ্যে তো রিজার প্রাবল্য থাকাই বাঞ্ছনীয়। যেমন রিজা অধ্যায়ে বলা হইয়াছে যে, রিজার উপকরণ যেই পরিমাণ বিদ্যমান থাকে, সেই পরিমাণই রিজা হইয়া থাকে। ক্ষেতে বীজ বপন করিয়া ফসল উৎপাদনের উদাহরণ দ্বারা উহার আলোচনা করা হইয়াছে। সুতরাং উহার আলোকেই প্রশ্ন উঠিতে পারে, যেই ব্যক্তি ভাল বীজ বপন করিয়া যথাযথভাবে উহার পরিচর্যা করিবে, এমন ব্যক্তির পক্ষে ফসল প্রাপ্তির রিজা প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক। তাহার খওফ কখনো রিজার সমান হইতে পারে না। সুতরাং মোত্তাকীগণের অন্তরে রিজা প্রবল হওয়াই স্বাভাবিক।

উপরোক্ত প্রশ্নের জবাব হইল, যাহারা নিছক শব্দ ও উদাহরণ দ্বারাই কোন বিষয়ের সঠিক অবস্থা অবগত হইতে চাহে, তাহাদের অধিকাংশই বিভ্রান্তির শিকার হয়। সুতরাং কৃষিকর্মের উপমার সঙ্গে বর্তমান আলোচ্য বিষয়ের হুবহু সাদৃশ্য স্থাপন করা যাইবে না। কারণ, রিজা প্রবল হওয়ার উপকরণ হইল এলেম- যাহা অভিজ্ঞতা দ্বারা হাসিল করিতে হয়। তো ইতিপূর্বে আমরা কৃষিকর্মের যেই উদাহরণটি উল্লেখ করিয়াছি সেই ক্ষেত্রে তো অভিজ্ঞতা দ্বারা ভূমিটি উর্বর হওয়া, বীজ উন্নত হওয়া এবং আবহাওয়া অনুকূল হওয়া ইত্যাদি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা যাইতে পারে।

কিন্তু আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয়ে অভিজ্ঞতা দ্বারা যথাযথ জ্ঞান লাভ করিবার কোন উপায় নাই। এখানে বীজটির ভাল মন্দ যাচাই হয় নাই, একটি অপরিচিত ভূমিতে উহা বপন করিবার পর আর কখনো উহার তথ্যও লওয়া হয় নাই; তদুপরি এই জমিনে ফসল বিনষ্টের আশংকা কম, না বেশী তাহাও জানা যায় নাই। সুতরাং এই অবস্থায় কিষানের পক্ষে খওফের তুলনায় অধিক রিজা করা কখনো সম্ভব হইতে পারে না। বরং যাবতীয় চেষ্টা তদ্বির সম্পন্ন করিবার

পর এইরূপ আশা করা সঙ্গত নহে। কারণ, এখানে বীজটি হইল ঈমান এবং উন্নত ও উত্তম হওয়ার শর্তসমূহ খুবই সূক্ষ্ম। এই বীজের জমিন মানুষের অন্তর। মানুষের অন্তরের গোপন ব্যাধিসমূহ যেমন- শিরকে খফী তথা সূক্ষ্ম শিরক, নেফাক ও কপটতা, রিয়া এবং মনের কুস্বভাব ইত্যাদি উপসর্গসমূহ খুবই বারীক ও সূক্ষ্ম। এই জমিনের আপদ-বিপদ হইল মনের কামনা-বাসনা ও পার্থিব ভোগ-বিলাস এবং মন ভবিষ্যতে সেই সবের দিকে আকৃষ্ট হইয়া পড়া।

উপরে মনের যেই সূক্ষ্ম ব্যাধিসমূহের কথা বলা হইল, উহার মধ্যে একটিও এমন নহে যে, অভিজ্ঞতা দ্বারা উহার প্রকৃত অবস্থা জানা যাইবে। কারণ, এই ক্ষেত্রে এমন কিছু অবস্থা আছে যাহার প্রতিরোধ করা মানুষের ক্ষমতার বাহিরে এবং মানুষ কখনো উহার মুখোমুখি হইয়া উহার প্রতিকারের অভিজ্ঞতা অর্জন করিতে পারে নাই। আর শস্যক্ষেত্রের বিপর্যয়ের মত মানুষের ধ্বংসাত্মক অবস্থা হইল মউতের ভয়াবহ পরিস্থিতি। এই বিষয়েও মানুষের কোন অভিজ্ঞতা নাই। এই ক্ষেত্রে ফসল পাকিয়া উহা ঘরে তুলিয়া আনার সময়টি হইল, যেন কেয়ামত হইতে প্রত্যাবর্তন করিয়া জান্নাতে প্রবেশ করা। এই বিষয়েও মানুষের কোন পূর্ব অভিজ্ঞতা নাই। তবে যেই ব্যক্তি এই সকল বিষয়ের হাকীকত সম্পর্কে অবগত তাহার অন্তর যদি যয়ীফ ও দুর্বল হয়, তবে রিজার তুলনায় তাহার খওফ বেশী হইবে। পক্ষান্তরে অন্তর যদি শক্তিশালী ও মারেফাতে পূর্ণাঙ্গ হয় তবে এমন ব্যক্তির খওফ ও রিজা বরাবর হইবে। এমন নহে যে, খওফের তুলনায় রিজা প্রবল হইবে।

উপরে হযরত ওমর (রাঃ)-এর খওফ ও রিজার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে। তিনি সর্বদা নিজের মনের হালাত পর্যালোচনা করিতেন। এমনকি তিনি হযরত হুযাইফা (রাঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিতেন, তুমি আমার মধ্যে নেফাক ও কপটতার কোন আছর দেখিতে পাইতেছ কি? বর্তমানে এমন কয়জন আছে, যে নিজের মনকে গোপন নেফাক ও শিরক হইতে রক্ষা করিয়া চলে। যদি কেহ নিজের সম্পর্কে এমন ধারণা করে যে, আমার অন্তর পাক ও কলুষমুক্ত, তবুও তাহার সম্মুখে বিপর্যয়ের শিকার হওয়ার আরো অনেক ঘাঁটী রহিয়াছে। যেমন- হয়ত তাহার মাল সন্দেহযুক্ত করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ফলে সে নিজের সম্পর্কে যেইরূপ ধারণা করিতেছে, সেইরূপ না হইয়া সন্দেহযুক্ত মালের কারণে তাহার পরিণতি দাঁড়াইতেছে অন্য রকম।

তা ছাড়া যদি এই কথা মানিয়াও লওয়া হয় যে, কাহারো অন্তর হয়ত সকল বিবেচনাতেই নির্মল ও ত্রুটিমুক্ত এবং নিজের সম্পর্কে তাহার ধারণাও

বাস্তবানুগ; কিন্তু সে এই বিষয়ে কেমন করিয়া নিশ্চিত হইতে পারিল যে, মৃত্যু পর্যন্ত সে এই অবস্থার উপরই কায়েম থাকিতে পারিবে? অথচ হাদীছ দ্বারা জানা যায়– মানুষ হয়ত সারা জীবন জান্নাতীদের মত আমল করিবে, কিন্তু মৃত্যুর ঠিক পূর্বে মুহূর্তের জন্য হয়ত সে এমন কোন কাজ করিয়া বসিবে যে, উহার ফলে দোজখীদের আমলের উপরই তাহার মৃত্যু হইবে। অবশ্য ইহা স্পষ্ট কথা যে, মুহূর্তমাত্র সময়ের মধ্যে মানুষ নিজের অঙ্গ দ্বারা এমন কোন আমল করিতে পারে না যাহার কারণে সে দোযখী হইয়া যাইবে। তবে মনের স্খলন এত অল্প সময়ের মধ্যেও হওয়া সম্ভব। সুতরাং মৃত্যুর পূর্বে যদি মনের ভিতর এমন কোন ওয়াসওয়াসা চাপিয়া বসে, তবে মুহূর্তের মধ্যেই সারা জীবনের লালিত এবাদত-বন্দেগী ধ্বংস হইয়া যাইতে পারে। সুতরাং এতসব আশংকা ও বিপর্যয়ের সম্ভাবনা বিরাজমান থাকা সত্ত্বেও মানুষ কেমন করিয়া বেখওফ ও নির্ভয় হইতে পারে? সুতরাং দেখা যাইতেছে, খওফ ও রিজার ভারসাম্যপূর্ণ সহাবস্থানই মানুষের জন্য কল্যাণকর।

মানুষের মধ্যে যদি ব্যাপকভাবে রিজা প্রবল হইয়া পড়ে, তবে উহার ফলে মানুষ বিভ্রান্তির শিকার হওয়ারই সম্ভাবনা প্রবল হইবে এবং এই কথাই প্রমাণ করিবে যে, মানুষের মধ্যে আল্লাহর মারেফাত বিষয়ে এখনো বহু কমী রহিয়াছে। এই কারণেই আল্লাহ পাক মোমেন বান্দার সিফাত বর্ণনা প্রসঙ্গে খওফ ও রিজা একত্রে বর্ণনা করিয়াছেন। এরশাদ হইয়াছে–

يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَّ طَمَعًا

অর্থাৎ– তাহারা তাহাদের রবকে ভয় ও আশাসহ ডাকে।

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

يدعوننا رغبا و رهبا

অর্থাৎ– তাহারা আমাকে আশা ও ভয়সহ ডাকে।

কিন্তু বর্তমানে হযরত ওমর (রাঃ)-এর মত লোক কয়জন পাওয়া যাইবে, যাহার মধ্যে খওফ ও রিজা বরাবর হইবে? সুতরাং এখন যাহারা আছে তাহাদের পক্ষে খওফের প্রাবল্যই কল্যাণকর। কিন্তু এই খওফের প্রাবল্যের কারণে যদি মনে এমন নৈরাশ্য পয়দা হয় যে, ক্ষমা যখন পাওয়া যাইবেই না, সুতরাং আমল করিয়া আর কি লাভ? অর্থাৎ এইরূপ ধারণা সৃষ্টি হওয়ার পর যদি আমল ত্যাগ করিয়া গোনাহের কাজে পূর্বাধিক জড়াইয়া যায়, তবে ইহার নাম খওফ নহে, ইহা বরং 'কুনুত' বা নিরাশ হওয়া।

সুতরাং প্রকৃত খওফ হইল যাহা মানুষকে যাবতীয় পাপাচার হইতে বিতৃষ্ণা পয়দা করিয়া নেক আমলের প্রতি উৎসাহিত করে। হযরত ইয়াহ্ইয়া মোয়াজ বলেন, যেই ব্যক্তি শুধু খওফের কারণে এবাদত করে, সে দুশ্চিন্তার সাগরে ডুবিয়া যাইবে। আর যেই ব্যক্তি শুধু রিজার কারণে আল্লাহর এবাদত করিবে, সেই ব্যক্তি বিভ্রান্তির প্রান্তরে ঘুরপাক খাইতে থাকিবে। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি খওফ, রিজা ও মোহাব্বত– এই তিনটির সমন্বিত অনুভূতি লইয়া আল্লাহর এবাদত করিবে, সেই ব্যক্তি সঠিক পথে স্থির থাকিবে। সুতরাং আমলের ক্ষেত্রে খওফ, রিজা ও মোহাব্বতের উপর জমিয়া থাকা জরুরী বটে, কিন্তু মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্তই খওফের প্রাবল্য মানুষের জন্য কল্যাণকর। মৃত্যুর সময় অবশ্য রিজার প্রাবল্যই উত্তম। কারণ, খওফ হইল আমলে উৎসাহিত করার বেত্রদণ্ডবিশেষ। কিন্তু মৃত্যুর বিভীষিকার সময় মানুষের পক্ষে কোন আমল করা সম্ভব হয় না এবং এই সময় খওফের পীড়ন হইলে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া বিপর্যয়ের শিকার হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক।

সুতরাং মৃত্যুর কঠিন সময় অন্তরে আল্লাহর রহমতের রিজা পোষণ করাই বাঞ্ছনীয় এবং এই সময় একমাত্র রিজা ব্যতীত অপর কিছুই মুমূর্ষু ব্যক্তির অন্তরে সাহস ও শক্তি যোগাইতে পারে না। যেই পবিত্র সত্ত্বা হইতে রহমতের আশা ও রিজা করা হইবে, দুনিয়া হইতে চির বিদায়ের এই মুহূর্তে মওলায়ে কারীমের মোহাব্বতের আশ্রয় গ্রহণ করাই বান্দার পক্ষে কল্যাণকর। বরং এইরূপ হইলেই মওলার সঙ্গে এই মোলাকাৎ বান্দার নিকটও উত্তম মনে হইবে। কেননা, যেই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের সাক্ষাত ভালবাসে, আল্লাহ পাকও তাহার সাক্ষাত ভালবাসেন। আর এই অবস্থাটি কেবল রিজার মাধ্যমেই অর্জিত হইতে পারে।

সারকথা হইল, যেই ব্যক্তি আল্লাহ পাকের করম ও রহমের প্রত্যাশী হইবে, আল্লাহ পাকের নিকট সে প্রিয় হইবে এবং যাবতীয় এলেম-আমল ও আল্লাহর মারেফাতের সঙ্গে তাহারও মোহাব্বত পয়দা হইবে। কারণ, রিজার মাধ্যমে আল্লাহর সঙ্গে যার মোহাব্বত পয়দা হইয়াছে, সে নিশ্চিতভাবে জানিতে পারিয়াছে যে, মৃত্যুর পর অবশেষে আল্লাহ পাকের নিকটই গমন করিতে হইবে।

ইহা একটি স্বীকৃত কথা যে, মানুষ যখন তাহার কোন প্রিয় ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাত করে, তখন এই সাক্ষাত দ্বারা তাহার অন্তরে সেই পরিমাণই আনন্দ অনুভূত হয় সেই ব্যক্তির সঙ্গে তাহার যেই পরিমাণ মোহাব্বত আছে।

অনুরূপভাবে তাহার সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার সময়ও সেই মোহাব্বতের পরিমাপ অনুসারেই বেদনা ও কষ্ট অনুভব হইবে। সুতরাং মৃত্যুর সময় যদি কাহারো অন্তরে আওলাদ-ফরজন্দ, দোস্ত আহবাব ও দুনিয়ার বিষয়-সম্পদের মোহাব্বত প্রবল থাকে, তবে তাহার প্রিয় বস্তুসমূহ যেন দুনিয়াতেই ছিল এবং দুনিয়াই ছিল তাহার জান্নাত। কারণ, জান্নাত এমন স্থানকে বলা হয় যেখানে মানুষের প্রিয় বস্তুসমূহের সমাবেশ থাকে। সুতরাং দুনিয়ার প্রতি আসক্ত ব্যক্তির মৃত্যু যেন জান্নাত হইতে বহিষ্কৃত হওয়া এবং তাহার ও তাহার প্রিয় বস্তুসমূহের মধ্যখানে সবনিকাপাত হওয়া। বলাবাহুল্য, প্রিয় বস্তু হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়া মানুষের নিকট কষ্টকর হইয়া থাকে। সুতরাং দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যুর মাধ্যমে দুনিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়াও কষ্টকর হইবে। অর্থাৎ মৃত্যু তাহার জন্য এক মুসীবতের কারণ হইবে। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তির মন-মানস কেবল আল্লাহতে নিবেদিত এবং আল্লাহর জিকির-ফিকিরই যাহার কর্ম; এমন ব্যক্তির পক্ষে দুনিয়া যেন একটি কয়েদখানা। কারণ, কয়েদখানা এমন স্থানকে বলা হয়, যেখানে মানুষ নিজের ইচ্ছামত সুখ ভোগ করিতে পারে না। সুতরাং এমন ব্যক্তির পক্ষে মৃত্যু যেন কয়েদখানা হইতে মুক্তি লাভ করিয়া নিজের প্রিয়জনের নিকট গমন করার মত।

একজন কয়েদী দীর্ঘ কারাভোগের পর মুক্তি লাভের আনন্দ এবং দীর্ঘ অদর্শনের পর প্রিয়াস্পদের সাক্ষাত লাভ যে মানুষের নিকট কতটা সুখের কারণ হয় তাহা সহজেই অনুমেয়। অর্থাৎ বান্দা মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই এই সুখ প্রাপ্ত হয় এবং আল্লাহ পাক স্বীয় নেক বান্দাদের জন্য যেই অফুরন্ত নেয়মতের ঘোষণা দিয়াছেন অর্থাৎ যেই নেয়মত কোন চোখ কখনো দেখে নাই, কোন কান যাহার বিবরণ কখনো শোনে নাই এবং মানুষের কল্পনাশক্তিও যাহা কোন দিন কল্পনা করিতে পারে নাই; উহা এই সুখ নহে, উহা বরং পরে তাহারা যথাসময় প্রাপ্ত হইবে।

অনুরূপভাবে যাহারা দুনিয়ার জীবনকে আখেরাতের তুলনায় প্রাধান্য দিয়াছে, তাহাদের মৃত্যুকালীন কষ্টই চূড়ান্ত কষ্ট নহে। বরং পাপী বান্দাদের জন্য যেই ভয়াবহ আজাব প্রস্তুত করিয়া রাখা হইয়াছে, উহাও তাহারা যথাসময় প্রাপ্ত হইবে। আমরা দোয়া করি, আল্লাহ পাক যেন আমাদিগকে মুসলমান অবস্থায় দুনিয়া হইতে উঠাইয়া নেন এবং ছালেহীনদের সঙ্গে মিলিত হওয়ার তাওফীক দান করেন। আল্লাহ পাকের মোহাব্বত ব্যতীত মানুষের এই বাসনা কবুল হইবার নহে এবং অন্তর হইতে দুনিয়ার মোহাব্বত দূর না করা পর্যন্ত এই

মোহাব্বতও হাসিল হইবার নহে। সুতরাং এই প্রসঙ্গে রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেই দোয়া করিতেন আমাদের পক্ষেও সেই দোয়া করাই উত্তম। তিনি আরজ করিতেন–

اللهم ارزقنى حبك و حب من أحبك و حب ما يقي بني إلى حبك و اجعل

حبك أحب إلى من الماء البارد

অর্থঃ আয় আল্লাহ! আমাকে দান কর তোমার মোহাব্বত এবং যে তোমাকে মোহাব্বত করে তাহার মোহাব্বত এবং আমাকে সেই আমলের মোহাব্বত দান কর, যাহা আমাকে তোমার নিকটবর্তী করিয়া দেয়। তোমার মোহাব্বত আমার নিকট ঠাণ্ডা পানি হইতেও প্রিয় করিয়া দাও।

সারকথা হইল, মৃত্যুর সম রিজার প্রাবল্যই উত্তম। কারণ, এই রিজা দ্বারা বান্দার অন্তরে আল্লাহ পাকের মোহব্বত পয়দা হয়। আর মৃত্যুর পূর্বে খওফ উত্তম। এই খওফের দ্বারাই পার্থিব ভোগ-বিলাস ও কামনা-বাসনার অগ্নি নির্বাপিত হইয়া দুনিয়ার মোহ কাটিয়া যায়। এই কারণেই মৃত্যুর সময় আল্লাহ পাকের প্রতি সুধারণার কথা উল্লেখ করিয়া রাসূলে আকরাম ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন–

لا يموتن احدكم الا و هو يحسن الظن بربه

অর্থাৎ, স্বীয় পালনকর্তা সম্পর্কে সুধারণা ছাড়া যেন তোমাদের কেহ মৃত্যুবরণ না করে।

অন্য হাদীসে আছে–

انا ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء

অর্থাৎ– আমি আমার বান্দার সঙ্গে থাকি। সুতরাং সে আমার সম্পর্কে যেইরূপ ইচ্ছা ধারণা করুক।

হযরত সুলাইমান (আঃ)-এর ইন্তেকাল নিকটবর্তী হইলে তিনি নিজের ছেলেকে বলিলেন, বেটা! আমার নিকট আল্লাহ পাকের রিজা তথা তাহার রহমতের আশা সম্পর্কিত কথাবার্তা বল এবং আমার মৃত্যু হওয়া পর্যন্ত তাহা অব্যাহত রাখ। কারণ, আমি আল্লাহর প্রতি 'হুসনে যন্' ও সুধারণা লইয়া তাঁহার সঙ্গে মিলিত হইতে চাই।

প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) মৃত্যুর সময় নিজের মধ্যে খওফ অনুভব করিলে ওলামায়ে কেরামকে ডাকাইয়া জড়ো করিলেন, যেন

তাহারা আশা ও রিজার কথা আলোচনা করিয়া তাহাকে শোনান। অনুরূপভাবে হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রহঃ) মৃত্যুর সময় নিজের ছেলেকে বলিলেন, আমাকে ঐ হাদীস বয়ান করিয়া শোনাও যাহাতে 'হুসনে যন্' ও রিজা বর্ণিত হইয়াছে। অর্থাৎ আল্লাহওয়ালাদের এই সকল হালাতের উদ্দেশ্য ছিল যেন মৃত্যুর সময় অন্তরে আল্লাহর মোহাব্বত পয়দা হইয়া যায়।

উপরোক্ত প্রসঙ্গেই হযরত দাউদ (আঃ)-এর উপর ওহী নাজিল হইয়াছিল- আমার বান্দাদের নিকট আমাকে প্রিয় করিয়া দাও। তিনি উহার প্রক্রিয়া জানিতে চাহিলে এরশাদ হইল- তাহাদের নিকট আমার নেয়মত ও অনুগ্রহের কথা বর্ণনা কর।

সারকথা হইল, অন্তরে আল্লাহ পাকের মোহাব্বত লইয়া মৃত্যুবরণ করার মধ্যেই মানুষের সাফল্য। এই মোহাব্বত দুই উপায়ে হাসিল করা যায়। প্রথমতঃ আল্লাহর মারেফাত, দ্বিতীয়তঃ অন্তর হইতে দুনিয়ার মোহাব্বত এমনভাবে দূর করা যেন দুনিয়া কয়েদখানার মত মনে হইতে থাকে, যাহা প্রিয়াস্পদের সাক্ষাত হইতে আটক করিয়া রাখিয়াছে।

জনৈক বুজুর্গ স্বপ্নযোগে হযরত আবু সুলাইমান দারানী (রহঃ)-কে ভীষণ ভয় পাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি এমন ভয় পাইতেছেন কেন? জবাবে তিনি বলিলেন, এইমাত্র আমি কয়েদখানা হইতে মুক্তি পাইলাম। প্রভাতে ঘুম হইতে জাগ্রত হইয়া তিনি লোকজনের নিকট হযরত আবু সুলাইমানের অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, গত রাতে তিনি ইন্তেকাল করিয়াছেন।

খওফ হাসিল করার উপায়

এক্ষণে আমরা সংক্ষেপে খওফ হাসিল করার উপায় আলোচনা করিব। খওফ মানুষের অন্তরে সাধারণতঃ দুইটি ছুরতে পয়দা হয় এবং এই দুইটি ছুরতের মধ্যে একটি অপেক্ষা অপরটি উত্তম। উহার উদাহরণ এইরূপঃ মনে কর, একটি বালক কোন গৃহে একাকী বসিয়া আছে এবং এই সময় হঠাৎ একটি সাপ আসিয়া তথায় উপস্থিত হইল। এক্ষণে ইহা অসম্ভব নহে যে, অবুঝ বালক হাত বাড়াইয়া সাপটিকে ধরিয়া উহার সঙ্গে খেলা করিতে চাহিবে। কিন্তু এই সময় যদি বালকটির বাপ সেখানে উপস্থিত থাকে এবং তাহার বুদ্ধি-বিবেচনাও সুস্থ থাকে তবে সাপটিকে দেখিবামাত্র সে ভীত-সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িবে এবং পিতার অবস্থা দেখিয়া বালকটির অন্তরেও ভয় চাপিয়া বসিবে।

উপরোক্ত উদাহরণে পিতা-পুত্রের ভয়ের কারণ ভিন্ন ভিন্ন। পিতা ভয় করিতেছে সাপের স্বভাব ও বিষক্রিয়া সম্পর্কে অবগতির কারণে। আর অবুঝ পুত্র স্রেফ পিতার দেখাদেখি ভয় পাইতেছে যে, পিতা নিশ্চয়ই কোন সঙ্গত কারণেই ভয় পাইতেছেন।

এই উদাহরণের আলোকেই উপলব্ধি করা সহজ হইবে যে, আল্লাহ পাককে ভয় করারও দুইটি অবস্থা রহিয়াছে। প্রথমতঃ তাঁহার আজাবকে ভয় করা। দ্বিতীয়তঃ তাঁহার জাত ও সত্ত্বাকে ভয় করা। এই শেষোক্ত অবস্থায় যাহারা আল্লাহকে ভয় করেন তাহারা হইলেন আলেম ও কাশফের অধিকারী ব্যক্তিবর্গ, যাহারা এলেম ও কাশফের কারণে আল্লাহর হায়বত, রোব, জালাল এবং আল্লাহর শক্তি ও ক্ষমতার কথা জানিতে পারিয়াছেন। পবিত্র কালামে বর্ণিত নিম্নোক্ত আয়াতের রহস্যও ইহাই-

وَ يُحَذِّرُكُمُ اللّٰهُ نَفْسَهُ

অর্থাৎ- "আল্লাহ তাঁহার নিজের সম্পর্কে তোমাদেরকে সাবধান করিতেছেন।"

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে-

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهِ

অর্থাৎ- "হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে যেমন ভয় করা উচিত ঠিক তেমনিভাবে ভয় করিতে থাক।" অনুরূপভাবে প্রথম প্রকার খওফ হইল যাহা সাধারণ মানুষের হইয়া থাকে। এই খওফ কেবল জান্নাত-জাহান্নামের একীন এবং এইগুলি আল্লাহর এবাদত-আনুগত্য ও তাঁহার নাফরমানীর প্রতিফল এই কথা বিশ্বাস করার কারণে সৃষ্টি হয়। তবে এই খওফ গাফিলতী ও ঈমানী কমজোরীর কারণে দুর্বল হইয়া পড়ে। অবশ্য ওয়াজ নসীহত শ্রবণ, কেয়ামতের বিভীষিকার কথা স্মরণ এবং আখেরাতের আজাব ও গজবের কথা চিন্তা করিলে এই দুর্বলতা দূর হইয়া যায়। তা ছাড়া খওফকারীদের সঙ্গলাভ এবং তাহাদের হালাত প্রত্যক্ষ করিলেও এই দুর্বলতা দূর হয়।

বর্ণিত দ্বিতীয় প্রকার খওফ যাহা তুলনামূলক উত্তম উহা হইল- আল্লাহ হইতে দূরে সরিয়া পড়া এবং আল্লাহ ও বান্দার মাঝে হিজাব ও আড়াল সৃষ্টি হওয়ার ভয় এবং তাঁহার নৈকট্য লাভের রিজা। হযরত জুন্নুন মিসরী (রহঃ) বলেন, মওলায়ে পাকের সঙ্গে বিচ্ছেদ সৃষ্টি হওয়ার ভয়ের তুলনায় দোজখের আজাবের ভয়, যেন সমুদ্রের তুলনায় এক ফোঁটা পানির মত। তো কালামে

পাকে এরশাদ হইয়াছে–

إِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمٰٓؤُا

অর্থাৎ– "বান্দাদের মধ্যে আলেমগণই আল্লাহকে ভয় করে।" তবে সাধারণ মোমেনদের মাঝেও এই ভয় কিছুটা বিদ্যমান থাকে বটে, কিন্তু উহা নিছক তাকলিদী বা অপরের দেখাদেখি। যেমন উপরে বর্ণিত উদাহরণে অবুঝ শিশু পিতার দেখাদেখি সাপকে ভয় করিয়াছিল। এই তাকলিদী ভয়ের মধ্যে অন্তর্দৃষ্টি থাকে না বিধায় ইহা দুর্বল থাকে এবং দ্রুত বিলীন হইয়া যায়। এমনকি সেই অবুঝ শিশু যদি কখনো কোন সাপুড়িয়াকে মন্ত্রপ্রয়োগে সাপ ধরিতে দেখে, তবে সে নিজেও বিভ্রান্ত হইয়া সাপুড়িয়ার দেখাদেখি হাত বাড়াইয়া ঐ সাপকে ধরার দুঃসাহস করিয়া বসিবে। অর্থাৎ পিতার দেখাদেখি যেমন সাপকে ভয় করিয়াছিল, এইবার সাপুড়িয়ার দেখাদেখি উহাকে ধরার অনুকরণ করিতেছে। অর্থাৎ তাক্বলিদী অনুকরণ এইরূপই দুর্বল হইয়া থাকে। তবে এই ক্ষেত্রেও যদি ভয়ের আসবাবসমূহ সর্বদা অনুকরণ করা হয় এবং সেই অনুযায়ী দীর্ঘদিন এবাদতে মনোযোগ ও পাপাচার হইতে পরহেজ করা হয়, তবে খওফে শক্তি সঞ্চয় হইয়া উহাও দৃঢ় হইয়া যায়।

সারকথা হইল, যেই ব্যক্তি মারেফাতের স্তরে উন্নীত হইয়া আল্লাহ পাকের সঠিক পরিচয় লাভ করিয়াছে, সে নিজে নিজেই খওফ করিতে থাকে। এই খওফ হাসিলের জন্য কোন উপায় অবলম্বন বা এলাজের প্রয়োজন হয় না। যেমন কোন ব্যক্তি হিংস্র জন্তুর স্বভাব প্রকৃতি সম্পর্কে অবগত হওয়ার পর যদি নিজেকে উহার নাগালের মধ্যে দেখিতে পায়, তবে নিজে নিজেই উহাকে খওফ করিতে থাকে। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে উহার প্রতি ভয় সৃষ্টির জন্য কোন তদ্বির করিতে হয় না। এই কারণেই আল্লাহ পাক হযরত দাউদ (আঃ)-এর উপর ওহী নাজিল করেন– "আমাকে ভয় কর, যেমন হিংস্র জন্তুকে ভয় করা হয়।" অর্থাৎ হিংস্রজন্তুকে ভয় করার জন্য উহার স্বভাব সম্পর্কে অবগতি এবং উহার থাবায় আক্রান্ত হওয়ার অবস্থাটি জানা থাকাই যথেষ্ট। সুতরাং যেই ব্যক্তি আল্লাহর মারেফাত ও তাঁহার যথার্থ পরিচয় অবগত হইবে, সে ইহাও জানিবে যে, তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করেন এবং যাহা ইচ্ছা তাহাই আদেশ করেন এবং এই ক্ষেত্রে তিনি কোন কিছুরই পরওয়া করেন না। তিনি কাহাকেও ভয় করেন না।

বেনিয়াজ পরওয়ারদিগারের এমনই শান যে, তিনি কোন পূর্ব কারণ ছাড়াই ফেরেশতাদিগকে কোররব ও নৈকট্য দান করিয়াছেন। পক্ষান্তরে ইবলিস কোন পূর্ব কারণ ছাড়াই আল্লাহর হুকুম অমান্য করার অপরাধে সংশ্লিষ্ট হইয়া রহমতের দরবার হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে। তিনি এমনই লাপরওয়া ও বেনিয়াজ সত্ত্বা যাঁহার অবস্থা হাদীসে কুদসীতে এইভাবে বিবৃত হইয়াছে– "তাহারা জান্নাতে কিংবা জাহান্নামে অবস্থান করিবে, এই বিষয়ে তাঁহার কিছুমাত্র পরওয়া নাই।"

এক্ষণে যদি কেহ এইরূপ মনে করে যে, কাহাকেও বিনা অপরাধে আজাব দেওয়া হয় না এবং কোন এবাদত ব্যতীত ছাওয়াবও দেওয়া হয় না; তবে সে যেন এই কথাও ভাবিয়া দেখে, তবে কি কারণে অনুগত বান্দার সম্মুখে আনুগত্যের উপকরণসমূহ এমনভাবে সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হয় যে, অতঃপর ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক, তাহাকে আনুগত্য করিতেই হয়? অনুরূপভাবে একজন গোনাহগারের সম্মুখে গোনাহের যাবতীয় উপায়-উপকরণ এমনইভাবে জড়ো করিয়া দেওয়া হয় যে, অতঃপর আপনা আপনি তাহাকে ঐ গোনাহে জড়াইয়া পড়িতে হয়। অর্থাৎ আল্লাহ পাক যখন কুপ্রবৃত্তি এবং উহার চরিতার্থ করিবার উপকরণ ও শক্তি পয়দা করিয়া দেন, তখন তো বান্দার পক্ষে উহাতে জড়াইয়া পড়া অবশ্যম্ভাবী হইবে। গোনাহগারকে রহমতের দরবার হইতে বহিষ্কার করার কারণ হইল, সে অপরাধে লিপ্ত হইয়াছিল। কিন্তু এই ক্ষেত্রে আমরা বলিব– একজন গোনাহগারকে যে অপরাধ করার শক্তি দান করিয়া অপরাধ করার সুযোগ দেওয়া হইল, এইরূপ কি কারণে করা হইল? তাহার দ্বারা কি ইতিপূর্বে অপর কোন অপরাধও হইয়াছিল, যাহার শাস্তি হিসাবে তাহার দ্বারা ঐ অপরাধ হইয়াছে? আসলে বান্দার প্রথম অপরাধ সম্পর্কে ইহাই বলা হইবে যে, উহার পূর্বে তাহার কোন অপরাধ ছিল না। বরং সৃষ্টির সূচনাতেই তাহার ভাগ্যে এইরূপই লেখা ছিল। এখন ইহার রহস্য কি তাহা সকলের বোধগম্যের বিষয় নহে। যেই ব্যক্তি এই রহস্যের প্রকৃত কারণ জানিতে পারিবে যাহা কেবল হেদায়েতের নূর দ্বারাই জানা সম্ভব– সেই ব্যক্তি খাস আরেফগণের মধ্যে গণ্য হইবেন, যাঁহারা তাকদীর ও ভাগ্যের রহস্য সম্পর্কে অবগত।

পক্ষান্তরে যাহারা শুনিয়া শুনিয়া ঈমান আনিবে এবং শুনিবার সঙ্গে সঙ্গেই বিশ্বাস স্থাপন করিবে, তাহারা সাধারণ মোমেন এবং তাহাদের সকলের পক্ষেই খওফ এক রকম হইবে। কেননা, সকল মানুষই আল্লাহ পাকের কুদরতের আওতায় এক রকম। যেমন, হিংস্র জন্তুর বিচরণক্ষেত্রে একটি অবুঝ ও দুর্বল বালকের অবস্থান। অর্থাৎ হিংস্র প্রাণী হয়ত কোন সময় ভুলক্রমে বালকটিকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় আবার কোন সময় হয়ত আক্রমণ করিয়া বালকের দেহটি খণ্ডবিখণ্ড করিয়া ফেলে। এই সকল অবস্থা 'ঘটনাক্রম' অনুযায়ীই হইয়া থাকে এবং এই 'ঘটনাক্রম' এর উপকরণও তাক্বদীরের মাধ্যমেই নির্দিষ্ট হয়।

সুতরাং এই বিষয়ে যেই ব্যক্তির সুস্পষ্ট জ্ঞান নাই সে এই ঘটনা দেখিয়া উহাকে নিছক 'ঘটনাক্রম'-ই মনে করিবে। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি এই কথা জানে যে, আল্লাহ পাক সর্ব বিষয়ে অবগত, সে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া ইহাকে নিছক 'ঘটনাক্রম' মনে করিবে না এবং এইরূপ বলিবে না যে, ইহা এইভাবেই ঘটিয়া গিয়াছে।

কিন্তু হিংস্রজন্তুর বিচরণক্ষেত্রে অবস্থানকারী ব্যক্তি যদি পূর্ণাঙ্গ মারেফাতের অধিকারী হয়, তবে সে ঐ জন্তুকে খওফ করিবে না। কারণ, সে ভালভাবেই ইহা জানে যে, ঐ জন্তুও আল্লাহ পাকের হুকুমের অধীন। যদি উহার মধ্যে ক্ষুধা সৃষ্টি করিয়া দেওয়া হয়, তবে উহা আক্রমণ করিবে। আর যদি অন্যমনস্কতা পয়দা করিয়া দেওয়া হয় তবে তাহাকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে। সুতরাং যে আল্লাহর হুকুমের অধীন, তাহাকে ভয় করিবার কোন কারণ নাই। বরং ঐ সত্তাকেই ভয় করিতে হইবে যিনি হিংস্র জন্তুর মধ্যে আক্রমণের সিফত পয়দা করিয়াছেন। সুতরাং দেখা যাইতেছে, আল্লাহকে ভয় করার ক্ষেত্রে হিংস্রপ্রাণীকে ভয় করার যেই উদাহরণ দেওয়া হইয়াছে সেই ক্ষেত্রেও উহার আবরণ উন্মুক্ত করিলে দেখা যাইবে যে, হিংস্রপ্রাণীকে ভয় করা যেন সরাসরি আল্লাহকেই ভয় করা। কারণ, হিংস্রপ্রাণীর মাধ্যমে ধ্বংস করার মালিকও সেই তিনিই।

এখন এই বিষয়টা ভালভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে যে, আখেরাতের হিংস্র প্রাণীও দুনিয়ার হিংস্র প্রাণীর মতই। অর্থাৎ, দুনিয়াতে যেমন উহা আল্লাহর হুকুম ব্যতীত কিছুই করিতে পারে না, অনুরূপভাবে পরকালেও যাহা যাহা ঘটিবে উহা আল্লাহর হুকুমেই ঘটিবে। অর্থাৎ, আল্লাহ পাক আজাব ও ছাওয়াবের আসবাব পয়দা করিয়াছেন এবং উহার জন্য কিছু মানুষও সৃষ্টি করিয়াছেন। যেমন, আল্লাহ পাক জান্নাত সৃষ্টি করিয়াছেন এবং উহার জন্য নির্দিষ্ট কিছু মানুষও সৃষ্টি করিয়াছেন যাহারা জান্নাতের ছামান সংগ্রহের জন্য আল্লাহর পক্ষ হইতেই আদিষ্ট। এখন ইচ্ছায় হউক অনিচ্ছায় হউক, তাহারা আল্লাহর ঐ আদেশ মানিতে বাধ্য। অনুরূপভাবে দোজখ সৃষ্টি করিয়াও তিনি উহার জন্য এমন কিছু মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহারা দোজখের ছামান সংগ্রহ করিতে বাধ্য। এইবার যাহারা আপন সত্ত্বাকে তাকদীর ও ভাগ্যের এই পরিমণ্ডলে আবদ্ধ দেখিবে, তাহাদের অন্তরে অবশ্যই খওফ প্রবল না হইয়া পারিবে না। এই পর্যায়ে তাহাদেরই খওফ হইবে যাহারা তাক্বদীরের রহস্য উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। কিন্তু যাহারা এই পর্যায় পর্যন্ত পৌঁছাইতে সক্ষম হয় নাই, তাহাদের এলাজ হইল- খওফকারী ও আরেফীনদের হালাত এবং তাঁহাদের বাণীসমূহ অধ্যয়ন

করা। এখানে প্রথমোক্ত শ্রেণীটি উত্তম। কেননা, তাঁহারা হইলেন আম্বিয়া ও ওলামা। আর দ্বিতীয় শ্রেণীটি অর্থাৎ যাহারা খওফহীন, তাহারা হইল অহংকারী, জাহেল ও নির্বোধ। পবিত্র কোরআনে এরশাদ হইয়াছে-

اِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ غَيْرُ مَامُوْنٍ *

"নিশ্চয় তাহাদের পালনকর্তার শাস্তি হইতে ভয়হীন থাকা যায় না।"

অর্থাৎ যেই ক্ষেত্রে স্বয়ং আল্লাহ পাক প্রকাশ্য ঘোষণার মাধ্যমে নির্ভয় থাকিতে বারণ করিতেছেন, সেই ক্ষেত্রে বান্দার পক্ষে মুহূর্তের জন্যও নির্ভয় থাকিবার কোন উপায় আছে কি? জনৈক আরেফ বলেন, কোন ব্যক্তি যদি আমার সঙ্গে সুদীর্ঘ পঞ্চাশ বৎসর ঈমানদার অবস্থায় অতিবাহিত করার পর মুহূর্তের জন্য একটি খুঁটির আড়াল হইয়া ইন্তেকাল করে, তবে আমি পরিপূর্ণ নিশ্চয়তার সঙ্গে বলিতে পারিব না যে, সে ঈমানের সহিত ইন্তেকাল করিয়াছে। কারণ খুঁটির আড়াল হওয়ার পর তাহার চিন্তা ও বিশ্বাসে কোন পরিবর্তন হইয়াছে কি-না তাহা আমি কেমন করিয়া বলিব?

প্রসঙ্গ ঃ ঈমানের সহিত মৃত্যু ও নেফাক

জনৈক বুজুর্গ আরেফ বলেন, যদি বাড়ীর ফটকে ইন্তেকাল করিলে শাহাদাত প্রাপ্তি হয়, আর ঘরের দরজায় ইন্তেকাল করিলে ঈমানের উপর ইন্তেকাল হয়, তবে আমি ইহাই পছন্দ করিব যে, ঘরের দরজাতেই আমি ঈমানের সহিত ইন্তেকাল করিব। কারণ, ঘর হইতে বাহির হইয়া বাড়ীর ফটকে যাওয়া পর্যন্ত আমার ঈমানের হেফাজত হইবে কিনা উহা আমি কেমন করিয়া বলিব।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) শপথ করিয়া বলেন, যেই ব্যক্তি মৃত্যুর সময় নিজের ঈমান বিনষ্ট হইয়া যাওয়ার বিষয়ে নির্ভয় থাকে, তাহার ঈমান অবশ্যই বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়।

হযরত সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) ইন্তেকালের সময় অত্যন্ত ভীত অবস্থায় কাঁদিতেছিলেন। উপস্থিত লোকেরা তাহাকে সান্ত্বনা দিয়া বলিল, আপনি আল্লাহ পাকের উপর রিজা করুন। কেননা, আপনার গোনাহ অপেক্ষা তাঁহার ক্ষমা অনেক বড়। জবাবে তিনি বলিলেন, আমি গোনাহের কারণে কাঁদিতেছি না। আমি যদি এই কথা জানিতে পারি যে, ঈমানের সঙ্গে আমার মৃত্যু হইবে, তবে আমার গোনাহ পাহাড় পরিমাণ হইলেও কোন দুঃখ করিব না।

কথিত আছে যে, এক ব্যক্তি তাহার ভাইকে ওসীয়ত করিল, আমার

ইন্তেকালের সময় তুমি আমার শিয়রে বসিয়া থাকিও। তুমি যদি দেখিতে পাও যে, ঈমানের সহিত আমার মৃত্যু হইয়াছে, তবে আমার সমস্ত সম্পদের বিনিময়ে বাদাম ও চিনি খরিদ করিয়া শহরের বালকদের মধ্যে বিতরণ করিয়া বলিবে, এক ব্যক্তি বন্দী অবস্থা হইতে মুক্তি পাইয়াছে, এই উপলক্ষেই এই শিন্নী বিতরণ করা হইতেছে।

পক্ষান্তরে আমার মৃত্যু যদি ঈমানের সহিত না হয়, তবে ইহাও সকলকে জানাইয়া দিবে যে, অমুক ব্যক্তি ঈমানের সাহত মৃত্যুবরণ করে নাই। মানুষ যেন আমাকে মোমেন মনে করিয়া আমার লাশের নিকট না আসে। অর্থাৎ মৃত্যুর পরও যেন আমার মধ্যে 'রিয়া' সংশ্লিষ্ট হইয়া মানুষ আমার দ্বারা প্রতারিত না হয়।

ভ্রাতার ওসীয়ত শোনার পর সে জিজ্ঞাসা করিল, ঈমানের সহিত আপনার মৃত্যু হইল কিনা তাহা আমি কেমন করিয়া জানিতে পারিব? জবাবে সে তাহাকে ঈমানের সহিত মৃত্যু হওয়ার কিছু আলামত বলিয়া দিল। পরে সে দেখিতে পাইল, আল্লাহ পাকের অশেষ মেহেরবানীতে ভ্রাতার বর্ণিত আলামত অনুযায়ী ঈমানের সঙ্গেই তাহার ইন্তেকাল হইয়াছে। অতঃপর সে ওসীয়ত অনুযায়ী শহরের বালকদের মধ্যে বাদাম ও চিনি বিতরণ করিয়া দিল।

হযরত আবু য়াজীদ বোস্তামী (রহঃ) বলেন, যখন আমি মসজিদে রওনা হই, তখন আমার মনে হইতে থাকে যেন আমার কোমরে পৈতা জড়ানো আছে এবং আমার আশঙ্কা হইতে থাকে, উহা আমাকে কোন গির্জা বা অগ্নি উপাসনালয়ে লইয়া না যায়। আমার মনে হয় যেন মসজিদে গমন করা পর্যন্ত উহা আমার সঙ্গে থাকে এবং মসজিদে প্রবেশ করিবার পরই উহা আমা হইতে পৃথক হয়। তিনি বলেন, প্রতি দিন পাঁচবার আমার এই অবস্থা হইয়া থাকে।

হযরত ঈসা (আঃ) বলেন, "হে লোকসকল! তোমরা গোনাহকে ভয় কর, আর আমরা পয়গম্বরগণ কুফরকে ভয় করিয়া থাকি।" নবীগণের ঘটনায় বর্ণিত আছে, এক পয়গম্বর বহু বৎসর পর্যন্ত আল্লাহর নিকট অন্ন-বস্ত্র ও একাকীত্বের অভিযোগ করিলেন। ঐ পয়গম্বরের লেবাস ছিল পশমের। তাঁহার অভিযোগের প্রেক্ষিতে ওহী নাজিল হইল, আমি তোমাকে কুফর হইতে হেফাজত করিলাম, কিন্তু তুমি ইহাতে সন্তুষ্ট হইলে না এবং আমার নিকট দুনিয়া প্রার্থনা করিতেছ? ঐ পয়গম্বর সঙ্গে সঙ্গে লজ্জিত হইয়া আরজ করিলেন, আয় পরওয়ারদিগার! আমি সন্তুষ্ট আছি। আমাকে কুফর হইতে হেফাজত করুন।

এক্ষণে ভাবিবার বিষয় হইল, আল্লাহ পাকের এমন আরেফ ও নেক

বান্দাগণ যাহাদের প্রতিটি কদম মজবুত ঈমানের উপর স্থাপিত, তাহারাই যদি অমঙ্গলজনক মৃত্যুর এমন আশঙ্কা করেন, তবে জয়ীফ ও দুর্বল ঈমানওয়ালাদের পক্ষে কেমন করিয়া অমঙ্গলজনক মৃত্যু বিষয়ে নির্ভয় থাকা সম্ভব হইতে পারে? মন্দ মৃত্যু হওয়ার এমন কিছু অবস্থা আছে যাহা মৃত্যুর পূর্বে মানুষ হইতে প্রকাশ পায়। যেমন, বেদআত, অহংকার, নেফাক-কপটতা এবং এই জাতীয় আরো কিছু অবস্থা। নেফাক বা কপটতা এমন ধ্বংসাত্মক বিষয় যাহা মৃত্যুর সময় মানুষের হালাত বিগড়াইয়া দেয়। এই কারণেই ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) নেফাককে খুব ভয় করিতেন।

হযরত হাছান (রাঃ) বলিতেন, আমি যদি এই কথা জানিতে পারি যে, আমি নেফাক হইতে পবিত্র, তবে উহা আমার নিকট দুনিয়া এবং উহার মধ্যস্থিত সকল বিষয় হইতে উত্তম মনে হইবে। আর তাহারা যেই নেফাকের কথা উল্লেখ করিয়াছেন, উহা সেই নেফাক নহে যাহা ঈমানের বিপরীতে অবস্থিত। বরং তাহাদের বর্ণিত 'নেফাক' এমন যাহা ঈমানের পাশাপাশিও অবস্থান করিতে পারে। অর্থাৎ ঐ নেফাকধারী একই সঙ্গে মোনাফেক ও মুসলমান হওয়াও সম্ভব ছিল। যেমন সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে একটি হাদীসের মাফহুম এইরূপ—

যেই ব্যক্তির মধ্যে চারিটি স্বভাব থাকিবে সে মোনাফেক। যদিও সে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে এবং নিজেকে মুসলমান মনে করে। আর যাহার মধ্যে উহা হইতে একটি থাকিবে, তাহার মধ্যে মোনাফেকীর একটি স্বভাব পাওয়া গেল— যতক্ষণ না সে উহা ত্যাগ করিবে। (সেই চারিটি স্বভাব এই—) যখন কথা বলিবে তখন মিথ্যা বলিবে, ওয়াদা করিলে উহা রক্ষা করিবে না, আমানত রাখা হইলে উহাতে খেয়ানত করিবে এবং ঝগড়া করার সময় মন্দ কথা বলিবে।

ছাহাবায়ে কেরাম ও তাবেয়ীগণ নেফাকের ব্যাখ্যায় বলিয়াছেন, কেবল ছিদ্দীক্বীনগণ ব্যতীত অপর কেহই ইহা হইতে মুক্ত নহে। হযরত হাছান বসরী (রহঃ) বলিয়াছেন, মানুষের ভিতর-বাহির দুই রকম হওয়া এবং অন্তর ও মুখ অভিন্ন না হওয়া ইহাই নেফাক। এখন আমরা জিজ্ঞাসা করি, এমন অবস্থা হইতে কয়জন মুক্ত থাকিতে পরিয়াছে? বরং মানুষ উহাতে এমনভাবে লিপ্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, এখন আর কেহই উহাকে কোন অপরাধ মনে করিতেছে না।

হযরত হোজায়ফা (রাঃ) বলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে যেই শব্দ উচ্চারণ করিলে মানুষ মোনাফেক হইয়া যাইত, ঐ একই শব্দ

হয়ত বর্তমানে লোকেরা দিনের মধ্যে দশবারও বলিতেছে। ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) বলিতেন, তোমরা এমন কাজ করিতেছ যাহা তোমাদের নজরে চুল হইতেও চিকন (অর্থাৎ অতি সাধারণ) মনে করিতেছ। কিন্তু রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে উহাকেই আমরা কবীরা মনে করিতাম।

এক ব্যক্তি হযরত ইবনে ওমর (রাঃ)-এর নিকট আরজ করিলেন, আমরা কোন আমীর-উমারার নিকট যাওয়ার পর তাহারা যাহা যাহা বলেন, আমরা উহাতেই সম্মতি জ্ঞাপন করিতে থাকি। কিন্তু তথা হইতে প্রত্যাবর্তনের পর উহাকেই আমরা খারাপ বলিতে থাকি। হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলিলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে উহাকে আমরা নেফাক মনে করিতাম।

একদা হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) শুনিতে পাইলেন, এক ব্যক্তি হাজ্জাজকে মন্দ বলিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে তিনি লোকটিকে বলিলেন, হাজ্জাজ যদি এখন উপস্থিত থাকিত তবে তাহার সম্মুখেও তুমি এইরূপ মন্তব্য করিতে কি? জবাবে লোকটি বলিল, তাহার সম্মুখে অবশ্য বলিতাম না। এইবার তিনি বলিলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ইহাকেই আমরা নেফাক মনে করিতাম। সংশ্লিষ্ট প্রসঙ্গে আরো গুরুতর অবস্থা হইল, একদা কয়েক ব্যক্তি হযরত হুজাইফা (রাঃ)-এর ঘরের দরজার সম্মুখে বসিয়া অপেক্ষারত অবস্থায় নিজেদের মধ্যে তাঁহার প্রসঙ্গে আলোচনা করিতেছিল। কিছুক্ষণ পর তিনি দরজা খুলিয়া তথায় আগমন করিলে তাহারা সসম্ভ্রমে নীরব হইয়া গেল। হযরত হুজাইফা (রাঃ) তাহাদিগকে বলিলেন, এতক্ষণ তোমরা যাহা বলিতেছিলে উহা বলিতে থাক। কিন্তু কাহারো মুখে কোন কথা সরিল না এবং সকলেই নীরব রহিল। হযরত হুজাইফা (রাঃ) বলিলেন, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে ইহাকেই আমরা নেফাক মনে করিতাম।

হযরত হুজাইফা (রাঃ) বলিতেন, মানুষের এমন একটি মুহূর্ত আসে যখন তাহার অন্তর ঈমানে এমনভাবে পরিপূর্ণ হইয়া যায় যে, তখন অন্তরে সূঁচ বরাবরও নেফাক থাকে না। অনুরূপভাবে এমন মুহূর্তও আসে, যখন অন্তর নেফাকে পরিপূর্ণ হইয়া যায় এবং উহাতে সূঁচ বরাবরও ঈমানের অবকাশ থাকে না।

সারকথা হইল, আরেফগণের অন্তরে সর্বদাই অমঙ্গলজনক মৃত্যুর খওফ বিরাজ করিতে থাকে। এই খওফের উপসর্গ বিভিন্ন যাহা অন্তিম সময়ের পূর্বে মানুষের আমলের সহিত আসিয়া যুক্ত হয়। উহার মধ্যে বিবিধ গোনাহ, বেদআত ও নেফাক ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। মানুষ সচরাচর এই সকল গোনাহ হইতে মুক্ত হইতে পারে না। কেহ যদি নিজের সম্পর্কে এমন ধারণা করে যে, আমি নেফাক হইতে মুক্ত, তবে তাহার এই ধারণাও নেফাক। এই প্রসঙ্গে একটি প্রসিদ্ধ উক্তি হইল- যেই ব্যক্তি নেফাককে ভয় করে না, সে মোনাফেক।

এক বুজুর্গ কোন আরেফকে বলিলেন, আমি নিজের সম্পর্কে নেফাকের ভয় করি। আরেফ বলিলেন, তুমি যদি মোনাফেক হইতে, তবে নেফাকের খওফ করিতে না।

মোটকথা, আরেফের দৃষ্টি সর্বদা অন্তিম সময়ের প্রতি নিবদ্ধ থাকে যে, মৃত্যু শুভ হইবে, না অশুভ। হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে-

العبد المؤمن بين مخافتين بين اجل قد مضى لا يدرى ما الله صانع فيه بين

اجل قد بقي لا يدرى ما الله فاض فيه فو الذي نفسي بيده ما بعد الموت

من مستعتب و لا بعد الدنيا دار الا الجنة و النار

অর্থঃ মোমেন বান্দা দুইটি খওফের মধ্যখানে অবস্থান করে। একটি অতীত সময় সম্পর্কে যে, আল্লাহ্ উহাতে কি করেন, জানা নাই। দ্বিতীয়তঃ আনেওয়ালা সময় সম্পর্কে যে আল্লাহ উহাতে কি হুকুম দিবেন তাহা জানা নাই। সেই আল্লাহর কসম যাঁহার হাতে আমার প্রাণ! মৃত্যুর পর সন্তুষ্টি হাসিল করার কোন উপায় নাই, আর দুনিয়ার পর জান্নাত কিংবা জাহান্নাম ব্যতীত অপর কোন ঘর নাই।

অমঙ্গলজনক মৃত্যুর বিবরণ

উপরে উপস্থাপিত আলোচনা দ্বারা জানা গিয়াছে, আরেফগণ অধিকাংশ সময় অমঙ্গলজনক মৃত্যুর আশঙ্কা করিয়া থাকেন। এইরূপ মৃত্যু সাধারণতঃ দুই প্রকার হইয়া থাকে। উহার মধ্যে একটি অবস্থা খুবই ভয়াবহ। অর্থাৎ- মৃত্যুযন্ত্রণা এবং উহার বিভীষিকা শুরু হওয়ার পর আল্লাহ্ পাকের জাত সম্পর্কে সন্দেহ কিংবা অস্বীকার প্রবল হওয়া এবং ঐ অবস্থায়ই রূহ বাহির হওয়া। এই সন্দেহ ও অস্বীকারের ফলে আল্লাহ পাকের সঙ্গে বান্দার হেজাব ও অন্তরায় সৃষ্টি হয়, যাহা আল্লাহ ও বান্দার মাঝে স্থায়ী দূরত্ব সৃষ্টির কারণ হয়।

দ্বিতীয় প্রকার মৃত্যু হইল যাহা ভয়াবহতার বিবেচনায় প্রথম প্রকার মৃত্যুর তুলনায় কিছুটা আছান। এই ক্ষেত্রে মৃত্যুর সময় বান্দার মনে কোন পার্থিব

বিষয়ের মোহাব্বত গালেব ও প্রবল হওয়া কিংবা দুনিয়াবী কোন বাসনা মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলা যে, উহার ফলে মন অন্য কোন দিকে নিবিষ্ট হওয়ার সুযোগ না থাকা এবং এই অবস্থায়ই রূহ বাহির হইয়া আসা। অর্থাৎ মৃত্যুর সময় বান্দার মন এই পার্থিব আচ্ছন্নতার কারণে তাহার চেহারা ও মস্তক দুনিয়ার দিকে ফিরানো থাকিবে। বান্দার চেহারা আল্লাহর দিক হইতে ফিরিয়া যাওয়ার ফলে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে অন্তরায় সৃষ্টি হইয়া আজাব নাজিল হইবে। কারণ, আল্লাহ পাক যেই আগুন প্রজ্বলিত করিয়াছেন, উহা কেবল আল্লাহর অন্তরালে অবস্থানকারী বান্দাদিগকেই স্পর্শ করিবে। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তির অন্তর 'হোব্বে দুনিয়া' ও পার্থিব বাসনা হইতে মুক্ত এবং যাহার অন্তর সর্বদা আল্লাহর স্মরণে মশগুল ছিল, আগুন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিবে, হে মোমেন! তুমি সামনে আগাইয়া যাও; তোমার নূর আমার শিখাকে নির্বাপিত করিয়া দিয়াছে।

মোটকথা, দুনিয়ার মোহাব্বত গালেব থাকা অবস্থায় যদি রূহ বাহির হয় তবে উহা আশঙ্কার বিষয়। কারণ, মানুষ দুনিয়াতে যেই হালাতের উপর দিন গুজরান করিয়াছে, মৃত্যুর সময় ঐ হালাতই তাহার অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। মানুষ নিজের অঙ্গ-অবয়বে যেই আমল জারী করে, উহাই অন্তরে প্রতিফলিত হয় এবং মৃত্যুর সময় ঐ অবস্থাটিই অন্তরকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখে। মৃত্যুর পর অন্তরের সেই আচ্ছন্ন অবস্থার বিপরীত কোন কিছু ঘটিবার সম্ভাবনা নাই। মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মানুষের আমল বন্ধ হইয়া যায়। তখন আর আমলে ব্রতী হওয়া কিংবা কৃত অপরাধের প্রতিকার- ইত্যাদি কোন কিছুরই সুযোগ থাকে না। এই সময় বান্দা এক চরম নৈরাশ্যের শিকারে পরিণত হয়। তবে মূল ঈমান ও আল্লাহর মোহাব্বত যেহেতু দীর্ঘ দিন অন্তরে বিরাজমান ছিল এবং নেক আমলের উপরও স্থির ছিল, এই দুই আমলের কারণে মৃত্যুর সময় সৃষ্ট বিপন্ন অবস্থা দূর হইয়া যায়। ঈমানের শক্তি যদি মিছকাল পরিমাণ হয় তবে শীঘ্রই দোজখ হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে। যদি এই পরিমাণের কম হয় তবে বহুকাল দোজখে থাকিতে হইবে। এই ঈমান যদি রতি পরিমাণও হয়, তবে হাজার বৎসর পরে হইলেও দোজখ হইতে নাজাত পাওয়া যাইবে।

উপরোক্ত বক্তব্যের প্রেক্ষিতে প্রশ্ন উঠিতে পারে, এই বক্তব্য দ্বারা তো ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, মৃত্যুর পর পরই গোনাহ্গারের উপর আজাব শুরু হইবে। তাহা হইলে কেয়ামত পর্যন্ত সুদীর্ঘকাল বিলম্বের হেতু কি? উহার জবাব এই যে, যাহারা কবরের আজাব অস্বীকার করে, তাহারা বেদআতী। এই

ভ্রান্তিতে আক্রান্ত লোকেরা আল্লাহর নূর, কোরআনের নূর এবং ঈমানের নূর হইতে বঞ্চিত। দৃষ্টিমান ব্যক্তিগণ ইহা নিশ্চিতভাবেই জানেন যে, কবর হয় দোজখের গর্তসমূহের মধ্য হইতে একটি গর্ত কিংবা জান্নাতের বাগিচা সমূহের মধ্য হইতে একটি বাগিচা। ইহা ছহী হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

সুতরাং মানুষের খাতেমা ও মৃত্যু যদি ভাল অবস্থায় না হয় তবে রূহ দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর কবর হইতেই তাহার আজাব শুরু হইয়া যায়। বিভিন্ন পর্যায়ে দোজখের সত্তরটি দরজা খুলিয়া দিয়া কবরবাসীকে বিভিন্ন রকম শাস্তি দেওয়া হয়। কবরে রাখার পর পর্যায়ক্রমে মনকীর-নকীরের সওয়াল, সন্তোষজনক জবাব দিতে অক্ষম হইলে শাস্তি, হিসাব-নিকাশের কঠিন অবস্থা এবং হাশরের মাঠে সকলের সম্মুখে অপমান ও লাঞ্ছনা, পুলসিরাত অতিক্রমের বিভীষিকা, আজাবের ফেরেশতাদের ভয়ানক অবস্থা ইত্যাদি যাহা যাহা হাদীসে পাকে বর্ণিত হইয়াছে উহার সকল কিছুর সম্মুখীন হইয়া আজাব ও মুসীবত ভোগ করিতে হইবে। তবে আল্লাহ পাক যদি কাহারো উপর করুণার দৃষ্টি বর্ষণ করেন তবে উহা ভিন্ন কথা। কিন্তু এমন ধারণা করা ঠিক নহে যে, ঈমানের স্থানটি মাটি খাইয়া ফেলে। বরং প্রকৃত অবস্থা হইল, মাটি মানব দেহের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ খাইয়া বিচ্ছিন্ন করিয়া দেওয়ার পর সেই নির্দিষ্ট দিনটি আসিয়া উপস্থিত হইবে, সেই দিন সেই বিচ্ছিন্ন অঙ্গ সমূহেকে পূর্ণবার জড়ো করিয়া পুনরায় উহাতে রূহ প্রদান করা হইবে।

মানুষ যদি নেককার ও ভাগ্যবান হয় তবে মৃত্যুর পর হইতে এই দিবস পর্যন্ত তাহাদের রূহ সবুজ পাখীর মধ্যে থাকিবে যাহা আরশের নীচে অবস্থান করে। পক্ষান্তরে মানুষ যদি হতভাগ্য হয়, তবে তাহার রূহ বর্ণিত অবস্থার বিপরীতে অন্য কোন খারাপ অবস্থায় থাকিবে।

এক্ষণে আমরা সেই সকল আসবাব ও উপকরণ প্রসঙ্গে আলোচনা করিব যাহা অমঙ্গলজনক মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে। অবশ্য উহার সংখ্যা এমনই ব্যাপক যে, উহার বিস্তারিত বিবরণ সম্ভব নহে। এখানে কেবল উদাহরণ হিসাবেই সামান্য আলোচনা করা হইতেছে। অমঙ্গলজনক মৃত্যু বা অন্তিম অবস্থা মন্দ হওয়ার কারণ দুইটি অবস্থার মধ্যে সীমিত।

প্রথম অবস্থা ঃ ওরা ও যুহ্দে কামেল তথা সংসারে পরিপূর্ণ অনাসক্ত ও যাবতীয় নেক আমল সম্পাদন সত্ত্বেও এই যাহেদের পক্ষে বেদআতী হওয়া সম্ভব। কারণ, একজন বেদআতীর আমল যত উত্তমই হউক, তাহার পরিণাম খারাপই হইয়া থাকে। এই 'বেদআত' দ্বারা নির্দিষ্ট কোন মজহাব বা ধর্মমত

বুঝানো উদ্দেশ্য নহে। বরং এই বেদআতের অর্থ হইতেছে– আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাত এবং তাঁহার গুণ-বৈশিষ্ট্য ও কোন অবাস্তব বিশ্বাস পোষণ করা, চাই উহা নিজের খেয়াল-খুশি, কেয়াস-বিবেচনা দ্বারা হউক কিংবা অনুরূপ কোন ব্যক্তির অনুসরণের মাধ্যমেই হউক। এইরূপ ব্যক্তির মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হওয়ার পর যখন মালাকুল মউতের চেহারা দেখিতে পায়, তখন নিজের সেই ভ্রান্ত বিশ্বাসের কারণে সে ভীত হইয়া পড়ে। কারণ, অনেক সময় মৃত্যুযন্ত্রণা শুরু হওয়ার পর সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি ইহা স্পষ্ট অনুভব করিতে পারে যে, অতীতে সে এই এই বিষয়ে ভ্রান্ত ধারণার উপর ছিল। এমতাবস্থায় সে কবল ঐ ভ্রান্ত বিশ্বাসটিকেই মিথ্যা মনে করিতে থাকে এমন নহে; বরং সে মনে করিতে থাকে, ইতিপূর্বে আমি যাহা যাহা বিশ্বাস করিতেছিলাম উহার সবই অবাস্তব। অর্থাৎ, ইতিপূর্বে তাহার আক্বীদার ক্ষেত্রে আল্লাহ ও তদীয় রাসূলের উপর বিশ্বাস এবং তাহার সেই ভ্রান্ত ধারণাটি সঠিক হওয়ার বিশ্বাস– এই দুই বিশ্বাসের মধ্যে কোন ব্যবধান ছিল না। উহার স্বাভাবিক ফল এই দাঁড়াইল যে, এই পর্যায়ে সে তাহার বিশুদ্ধ আকীদা সমূহকেও বাতিল মনে করিতে থাকে কিংবা সেইগুলি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করিতে থাকে। আল্লাহ না করুন, যদি এই অবস্থায় তাহার রূহ বাহির হয় তবে তাহার অন্তিম অবস্থাটি হয় অশুভ এবং সে শিরকের উপর মৃত্যুবরণ করে। নিম্নোক্ত আয়াতে এই শ্রেণীর লোকদের কথাই বলা হইয়াছে–

وَبَدَا لَهُمْ مِنَ اللّٰهِ مَا لَمْ يَكُوْنُوا يَحْتَسِبُوْنَ

অর্থাৎ– তাহাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হইতে এমন বিষয় উদ্‌ঘাটিত হইল, যাহা তাহারা কল্পনাও করিত না।

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْاَخْسَرِيْنَ اَعْمَالًا * اَلَّذِيْنَ ضَلَّ سَعْيُهُمْ فِي الْحَيٰوةِ وَهُمْ يَحْسَبُوْنَ اَنَّهُمْ يُحْسِنُوْنَ صُنْعًا *

অর্থাৎ– বলুন; আমি কি তোমাদিগকে সেই সকল লোকদের সংবাদ দিব, যাহারা কর্মের দিক দিয়া খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। তাহারাই সেই লোক, যাহাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে বিভ্রান্ত হয়; অথচ তাহারা মনে করে যে, তাহারা সৎকর্ম করিতেছে।

অনেক সময় ঘুমের মধ্যেও ভবিষ্যতের কোন কোন বিষয়ের বাস্তব উপলব্ধি হয়। ঘুমের হালাতে এইরূপ হওয়ার কারণ হইল, এই সময় মানুষের কলবে দুনিয়ার ফিকির হ্রাস পায়। অনুরূপভাবে মৃত্যুযন্ত্রণার সময়ও কোন কোন বিষয়ের

অবস্থা পরিষ্কার হইয়া যায়। কারণ, পার্থিব শোগল ও কাম-প্রবৃত্তি ইত্যাদি বিষয়গুলি রূহানী জগৎ ও লওহে মাহফুজের বাস্তব বিষয়াদি উপলব্ধির পথে অন্তরায় হইয়া থাকে। কিন্তু মৃত্যুযন্ত্রণার সময় যখন সেই অন্তরায় সরিয়া যায় তখন অপরাপর আক্বীদাসমূহের প্রতিও সংশয় সৃষ্টি হয়।

মোটকথা, যাহারা আল্লাহর জাত-সিফাত ও কর্ম সম্পর্কে নিজের বিবেক-বুদ্ধি ও কেয়াস কিংবা অন্যের অনুকরণ দ্বারা কোন অসঙ্গত ও অবাস্তব বিশ্বাস পোষণ করে তাহারা উপরোক্ত ভয়ানক পরিণতির শিকার হওয়ার আশংকা রহিয়াছে। যুহ্‌দ ও সংসার অনাসক্তি এবং শুধু নেক আমলই এই পরিণতি হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য যথেষ্ট হইবে না। বরং একমাত্র খালেছ এতেক্বাদ ও সত্য বিশ্বাস ছাড়া এই অবস্থা হইতে মুক্তির কোন উপায় নাই। অবশ্য গ্রামের সরল-সোজা ও সাদাসিধা মানুষের মত যাহারা আল্লাহ-রাসূল ও পরকালের উপর সংক্ষেপে ঈমান রাখে এবং উহার উপরই অবিচল থাকে– কথায় কথায় যুক্তি-তর্ক ও কারণ অনুসন্ধান করা যাহাদের স্বভাব নহে; উপরোক্ত বিপদ তাহাদের নিকট হইতে অনেক দূরে থাকিবে। এই প্রসঙ্গেই হাদীসে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

اكثر اهل الجنة البله

অর্থাৎ– অধিকাংশ জান্নাতী সরল-সোজা ও আত্মভোলা।

এই কারণেই আমাদের আকাবেরে দ্বীন ইসলামের আকায়েদ ও বিশ্বাস প্রসঙ্গে যুক্তি-তর্ক ও তত্ত্ব অনুসন্ধানের পিছনে পড়িতে নিষেধ করিয়া বলিয়াছেন– আল্লাহ পাক যাহা যাহা নাজিল করিয়াছেন উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন এবং বাহ্যিক বিবরণ দ্বারা যাহা বুঝে আসে উহাকেই অভ্রান্ত ও সঠিক মনে করিতে হইবে। কারণ, আল্লাহ পাকের জাত ও সিফাত প্রশ্নে যুক্তি-তর্কে অবতীর্ণ হওয়া খুবই নাজুক এবং এই পথ অত্যন্ত দুর্গম।

কিন্তু হালে যেন সকলেই উপরোক্ত প্রসঙ্গে অবতীর্ণ হইয়া নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী মত পেশ করিতেছে। এদিকে সকল মানুষের তবীয়ত ও ধ্যান-ধারণা যেহেতু অভিন্ন নহে, সুতরাং সকলে নিজ নিজ রায়কে প্রাধান্য দেওয়ার চেষ্টা করিতে থাকে এবং যাহারা উহা শ্রবণ করে তাহাদের মধ্যেও উহার বিশ্বাস জন্মিতে থাকে। এইভাবে ক্রমে আক্বীদার চর্চা এবং উহাতে অভ্যস্থ হইয়া পড়ার পর উহা স্থির বিশ্বাসে পরিণত হয় এবং উহা হইতে পরিত্রাণের আর কোন উপায় থাকে না। সুতরাং মানুষের জন্য নিরাপদ অবস্থা হইল নেক আমল করিতে থাকা এবং যেই সকল সূক্ষ্ম বিষয় নিজের বোধগম্যের বাহিরে সেই

সকল বিষয় লইয়া কোন চিন্তা না করা। কিন্তু সমস্যা হইল, বর্তমানে এই সকল বিষয়ের প্রতি মানুষের ঝোঁক এমনই বৃদ্ধি পাইয়াছে যে, জাহেল ও মূর্খ লোকদের সকলেই নিজ নিজ বিশ্বাসকে পরমার্থ জ্ঞান করিয়া নিজেকে ঈমানের গুণে পরিপূর্ণ গুণান্বিত মনে করিতেছে। কিন্তু কিছু দিন পর তাহারা ভালভাবেই নিজেদের বিভ্রান্তি টের পাইবে।

উপরের আলোচনার সারকথা হইল, যাহারা আল্লাহ, রাসূল ও কিতাবের উপর সঠিক ঈমান স্থাপন না করিয়া অযথা তর্ক-বিতর্ক ও তত্ত্ব অনুসন্ধানের পিছনে পড়িবে, তাহারা আপনাকে আপনি বর্ণিত বিপদে নিক্ষেপ করিবে। উহার উদাহরণ যেন এইরূপ– সাগর বক্ষে কাহারো নৌকা নিমজ্জিত হওয়ার পর উত্তাল তরঙ্গ মাঝে যখন হাবুডুবু খাইতে থাকে তখন ঐ অবস্থা হইতে মুক্তি পাইয়া ছহী-ছালামতে কূলে ফিরিয়া আসার ঘটনা খুব কমই ঘটিয়া থাকে। বরং এইরূপ ক্ষেত্রে সাগর বক্ষে নিমজ্জিত হইয়া প্রাণ হারানোই স্বাভাবিক। শেখ সা'দী (রহঃ) বলেন– (যাহার ভাবর্থ এই–)

-- জল ঘুর্ণয়নের এহেন বিপদের স্থানে আসিয়া অসংখ্য নৌযান ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে এবং উহা কুলে আসিতে পারে নাই।

দ্বিতীয় প্রকার ঃ অমঙ্গলজনক মৃত্যু ও অন্তিম অবস্থা অশুভ হওয়ার দ্বিতীয় কারণ হইল, ঈমান দুর্বল হইয়া দুনিয়ার মোহাব্বত প্রবল হওয়া। অর্থাৎ মানুষের ঈমান যখন দুর্বল হয় তখন অন্তরে আল্লাহর মোহাব্বতও দুর্বল হইয়া দুনিয়ার প্রতি মনের আকর্ষণ এমনই বৃদ্ধি পায় যে, অবশেষে অন্তরে আল্লাহর মোহাব্বতের কোন স্থান থাকে না। এমতাবস্থায় শয়তানের পথ হইতে ফিরিয়া থাকা এবং কুপ্রবৃত্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়িয়া তোলার কোন শক্তি থাকে না। ফলে মানুষ প্রবৃত্তির অনুসরণ করিতে থাকে এবং অন্তর কালো ও কঠিন হইয়া যায়। এইভাবে ক্রমাগত গোনাহে নিমজ্জিত থাকিবার ফলে অন্তরের সেই কালো দাগ জমাট বাধিতে থাকে এবং অন্তরে যৎসামান্য নূর যাহা অবশিষ্ট ছিল উহাও প্রতিনিয়ত কিছু কিছু হ্রাস পাইতে থাকে। এই পর্যায়ে এক সময় অন্তরে মরিচা ধরিয়া মোহর লাগার মত অবস্থা সৃষ্টি হইয়া যায়। এই পরিস্থিতিতে অবশেষে যখন দুনিয়া হইতে চির বিদায়ের সময় আসিয়া উপস্থিত হয় তখন আল্লাহর মোহাব্বত আরো দুর্বল হইয়া তাহার মনে হইতে থাকে যে, দুনিয়া ও দুনিয়ার ভোগ-বিলাস যাহা তাহার নিকট সর্বাধিক প্রিয় বস্তু ছিল এইবার তাহার নিকট হইতে উহা বিদায় হইতে চলিয়াছে। পৃথিবী হইতে বিচ্ছিন্ন হওয়ার এই বিরহ বেদনা তাহার অন্তরে এমন এক নিদারুন যাতনা সৃষ্টি করে যাহা তাহার

নিকট অসহনীয় মনে হইতে থাকে। এই সময় সে মনে মনে ভাবে, আমার প্রিয় বস্তু দুনিয়া হইতে বিদায় হওয়ার এই মৃত্যু আল্লাহ কেন আমার উপর নাজিল করিলেন? এই মৃত্যু তো একটি মন্দ জিনিস। এই মনোভাবের ফলে মৃত্যুযন্ত্রণার সময় আল্লাহ পাকের প্রতি মোহাব্বত পোষণের পরিবর্তে বিদ্বেষ সৃষ্টি হওয়ার আশঙ্কা দেখা দেয়।

যেমন কোন ব্যক্তি নিজের ছেলেকে মোহাব্বত করে। কিন্তু তাহার অন্তরে ছেলের মোহাব্বত অপেক্ষা ধন-দৌলতের মোহাব্বত অনেক বেশী। এমতাবস্থায় ছেলে যদি কোন উপায়ে তাহার সম্পদ বিনষ্ট করিয়া দেয়, তবে এমতাবস্থায় ছেলের প্রতি যেই দুর্বল মোহাব্বত ছিল উহা নিমিষে বিদ্বেষে পরিণত হইবে। অনুরূপভাবে মৃত্যুযন্ত্রণার সময় দুনিয়া বিনষ্ট ও বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে আল্লাহর প্রতি মোহাব্বত যদি বিদ্বেষে পরিণত হয়, তবে এই মৃত্যু হইবে অশুভ ও অমঙ্গলজনক।

ইহা দ্বারা জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি যদি মৃত্যুর সময় নিজের অন্তরে দুনিয়ার মোহাব্বত অপেক্ষা আল্লাহর মোহাব্বত প্রবল দেখিতে পায় তবে সে উপরোক্ত ভয়ানক পরিণতি হইতে রেহাই পাইবে। আসলে দুনিয়ার মোহাব্বতই হইল যাবতীয় অনিষ্টের মূল। এই অনিষ্টের ব্যাধিতে মোটামুটি সকলেই আক্রান্ত। উহার কারণ হইল, মানুষ যথাযথভাবে আল্লাহকে চিনিতে পারে নাই। যাহারা আল্লাহর পরিচয় পাইয়াছে তাহাদের অন্তরে অবশ্যই আল্লাহর মোহাব্বত পয়দা হইয়াছে।

কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَ اَبْنَاؤُكُمْ وَ اِخْوَانُكُمْ وَ اَزْوَاجُكُمْ وَ عَشِيْرَتُكُمْ وَ
اَمْوَالُ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَ تِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَ مَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ اِلَيْكُمْ
مِنَ اللّٰهِ وَ رَسُوْلِهٖ وَ جِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ *

অর্থ ঃ তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যাহা বন্ধ হইয়া যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান– যাহাকে তোমরা পছন্দ কর আল্লাহ, তাঁহার রাসূল ও তাঁহার পথে জেহাদ করা হইতে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর, আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত।

মোটকথা, যেই ব্যক্তি মনে করে যে, মৃত্যুর মাধ্যমে সে তাহার স্ত্রী-পরিজন

তথা প্রিয় বস্তু দুনিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়াছে, সে এই মৃত্যুকে খারাপ মনে করে এবং এই মৃত্যু যেহেতু আল্লাহ পাক দান করিয়াছেন, সুতরাং আল্লাহর প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা অবস্থায় সে দুনিয়া হইতে বিদায় গ্রহণ করে। এমন ব্যক্তির অবস্থা যেন সেই পলাতক গোলামের মত, স্বীয় মালিকের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করা অবস্থায় পলায়নের পর যাহাকে পাকড়াও করিয়া মালিকের নিকট আনিয়া হাজির করা হয়। এমন অবস্থায় মালিকের পক্ষ হইতে গোলামের উপর যেই লাঞ্ছনা ও শাস্তি বর্ষণ হইবে, তাহা আর বলিবার অপেক্ষা রাখে না।

পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি আল্লাহর প্রতি মোহাব্বত পোষণ করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে, তাহার অবস্থা যেন সেই অনুগত গোলামের মত, যে নিজের মালিককে মোহাব্বত করে এবং পরম আগ্রহের সহিত তাহার সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে কষ্টসাধ্য দীর্ঘ সফরের পর মালিকের নিকট আসিয়া হাজির হয়। বলাবাহুল্য, এইরূপ গোলাম মালিকের দরবারে হাজির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মালিকও তাহাকে আদর-আপ্যায়ন ও যত্নসহকারে বরণ করিয়া লইবেন।

অন্য প্রকার

আরেক প্রকার মৃত্যু আছে যাহা সন্দেহ ও অস্বীকার অবস্থার মৃত্যু তথা অমঙ্গলজনক মৃত্যু সংক্রান্ত উপরে বর্ণিত পরিণতি অপেক্ষা এই মৃত্যুর অশুভ পরিণতি কিছুটা কম হইবে। আর এইরূপ মৃত্যুবরণকারী ব্যক্তি অনন্তকাল দোজখে থাকিবে না। এইরূপ মৃত্যুরও দুইটি কারণ রহিয়াছে। প্রথমতঃ গোনাহের প্রাবল্য থাকা এবং এই ক্ষেত্রে চাই ঈমানও শক্তিশালী হউক। দ্বিতীয়তঃ ঈমান দুর্বল হওয়া, চাই সেই সঙ্গে গোনাহ কমই হউক। উহার কারণ এই যে, প্রতিনিয়ত অতিরিক্ত গোনাহ করিতে করিতে উহাতে অভ্যস্ত হইয়া পড়ার কারণে গোনাহ স্বভাবে পরিণত হইয়া যায়। আর মানুষ যেই বিষয়ে আজীবন অভ্যস্ত থাকে, মৃত্যুর সময় সেই সকল বিষয়ই তাহার অন্তরে ভাসিয়া উঠে। যেমন– যেই সকল ব্যক্তি অধিকাংশ সময় আল্লাহর এবাদত ও আনুগত্যে নিরত থাকে, মৃত্যুর সময়ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে আল্লাহর এতায়াত ও আনুগত্যের কথাই তাহাদের স্মরণে আসে। অনুরূপভাবে মানুষ যদি অধিকাংশ সময় আল্লাহর নাফরমানী ও পাপাচারে লিপ্ত থাকে, তবে মৃত্যুর সময় সেই সকল বিষয়ই তাহার মানসপটে ভাসিয়া উঠে।

উপরোক্ত আলোচনার আলোকে ইহাও জানা গেল যে, কোন ব্যক্তি যদি হামেশা গোনাহে লিপ্ত না হইয়া বরং মাঝে-মধ্যে গোনাহ করিয়া ফেলে, তবে সেই ব্যক্তি বর্ণিত অশুভ মৃত্যু হইতে মুক্ত থাকিবে। আর যেই ব্যক্তি কখনো

গোনাহ করে না, সেই ব্যক্তি নিশ্চিতভাবেই ঐ বিপদ হইতে নিরাপদ থাকিবে। পক্ষান্তরে যেই ব্যক্তি আল্লাহর আনুগত্যের তুলনায় নাফরমানীতেই অধিক লিপ্ত থাকে এবং আনুগত্যের তুলনায় নাফরমানীতেই যাহার অন্তর তুষ্ট থাকে, তাহার পক্ষে মৃত্যুকালীন বিপদের শিকার হওয়ার আশংকাও নিশ্চিতভাবেই অধিক করিতে হইবে। নিম্নের উদাহরণ দ্বারা এই বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা পাওয়া যাইবে।

ইহা একটি সুস্পষ্ট কথা যে, মানুষ স্বপ্নে সাধারণতঃ সেই সকল বিষয়ই দেখিয়া থাকে যেই সকল বিষয়ের সহিত তাহার মন-মানস ও কর্ম সর্বদা সংশ্লিষ্ট থাকে। অর্থাৎ, জাগ্রত অবস্থায় মানুষ যেই সকল বিষয়ের সহিত জড়িত থাকে, স্বপ্নযোগে যেন সেই সকল বিষয়ের সাদৃশ্য অবস্থাই তাহার সামনে ভাসিয়া উঠে। এমনকি যেই সকল অবিবাহিত যুবকের স্বপ্নদোষ হয়, তাহারা যদি জাগ্রত অবস্থায় বাস্তবে কখনো নারীসঙ্গম না করিয়া থাকে, (কিংবা উহা কল্পনা না করিয়া থাকে)। তবে স্বপ্নে সে কখনো সরাসরি সঙ্গমের অবস্থা দেখিবে না। অনুরূপভাবে যেই ব্যক্তি সর্বদা এলেম-ফেকাহ ইত্যাদি চর্চা করে, ঘুমের ঘোরেও সে আলেম-এলেম, ফেকাহ্ ইত্যাদি বিষয়ই দেখিতে পাইবে। অর্থাৎ নিদ্রিত অবস্থায় মানুষের অন্তরে সেই সকল বিষয়ই জাগ্রত হয়, যেই সকল বিষয়ের সহিত তাহার আত্মার নিবিড় সম্পর্ক থাকে। মানুষের মৃত্যু-পূর্ব মূর্ছাগত অবস্থাটিও নিদ্রার মতই। সুতরাং এই সময়ও মানুষের অন্তরে সেই সকল বিষয়ই আসিয়া হাজির হইবে, যেই অবস্থার উপর নিজের জীবন অতিবাহিত করিয়াছে।

মানুষ ইচ্ছা করিলেই কোন ভাল স্বপ্ন দেখিতে পায় না। অর্থাৎ এমন নহে যে, কোন ব্যক্তি হয়ত সর্বদা পাপাচারে লিপ্ত থাকে, কিন্তু নিদ্রা গ্রহণের পূর্বে ঝট্‌পট্ নেক স্বপ্ন দেখার ইচ্ছা করিল, আর বাস্তবেও সেই নেক স্বপ্নই দেখিতে পাইল। এইরূপ হওয়া সম্ভব নহে এবং ইহা মানুষের ক্ষমতার বাহিরে। মৃত্যুকালীন অবস্থাও উহার উপর কেয়াস করা যাইতে পারে। অর্থাৎ, মানুষ যদি নিজের জীবন আল্লাহর এতায়াত-আনুগত্য ও নেক আমলের উপর অতিবাহিত করে, তবে মৃত্যুর সময়ও নিজের অন্তরে অনুরূপ নেক অবস্থাই বিরাজ করিবে।

সুতরাং কোন ব্যক্তি যদি ইহা কামনা করে যে, মৃত্যুর সময় যেন তাহার অন্তরে কোন প্রকার গোনাহের খেয়াল না আসে, তবে উহার একমাত্র উপায় হইল নিজেকে সারা জীবন যাবতীয় পাপাচার ও গোনাহের কাজ হইতে ফিরাইয়া রাখা। ইহা মানুষের এখতিয়ারভুক্ত এবং ইচ্ছা করিলেই মানুষ নিজেকে কুপ্রবৃত্তির কামনা-বাসনা ও নাফরমানী হইতে হেফাজত করিতে পারে।

যাহারা এইরূপ করিবে, মৃত্যুযন্ত্রণার সময় উহা তাহাদের জন্য সহায়ক শক্তি হইবে। মানুষ যেই অবস্থার উপর জীবিত থাকে, ঐ অবস্থার উপরই তাহার মৃত্যু হয়। আর যেই অবস্থার উপর মৃত্যু হয়, কেয়ামতে পুনরায় তাহাকে সেই অবস্থার উপরই উঠানো হইবে।

জনৈক সব্জি বিক্রেতার ঘটনা হইল– মৃত্যুর সময় তাহাকে কালেমার তালকীন দেওয়া হইলে সে কেবল চার, পাঁচ, ছয় ইত্যাদি বলিতেছিল। কারণ, মৃত্যুর পূর্বে সে দীর্ঘ দিন যাবৎ কেবল হিসাব-কিতাব লইয়াই ব্যস্ত ছিল।

এক আরেফ বলেন, আরশ যেন এমন একটি মুক্তাবিশেষ যাহা নূর দ্বারা চমকিতে থাকে। সুতরাং মানুষ যেই অবস্থার উপর বিরাজ করে আরশে তাহার সেই অবস্থাই প্রতিবিম্বিত হয়। সেমতে মৃত্যুর সময় মানুষের উপর যেই অবস্থা বিরাজ করে, সেই সময় আরশেও তাহার সেই চিত্রই প্রতিফলিত হয়। এক্ষণে কোন ব্যক্তি যদি মৃত্যুর সময় নিজেকে গোনাহের ছুরতে দেখে, তবে আরশেও তাহার সেই ছুরতই প্রতিবিম্বিত হইবে এবং রোজ কেয়ামতেও নিজেকে সেই অবস্থায়ই দেখিতে পাইবে। কেয়ামতের সেই কঠিন দিনে মানুষ যখন একে একে নিজের পাপাচারের সকল অবস্থা দেখিতে পাইবে, তখন তাহার মনে অনুশোচনা ও খওফের যেই করুণ অবস্থা সৃষ্টি হইবে তাহা বর্ণনা করিবার মত নহে। এই কারণেই আল্লাহর আরেফগণ সর্বদা অমঙ্গলজনক মৃত্যুর আশঙ্কা করিতেন যে, মৃত্যু শুভ হওয়া ইহা মানুষের এখতিয়ারভুক্ত নহে। ইচ্ছা করিলেই যেমন মানুষ ভাল স্বপ্ন দেখিতে পারে না, অনুরূপভাবে ইচ্ছা করিয়া নিজের "শুভমৃত্যু" ঘটানোও সম্ভব নহে। অবশ্য সেই সময় মানুষের সারা জীবনের আমলের প্রভাব পড়িবে বটে, কিন্তু মৃত্যুর সময় মনের খেয়াল ও ধারণাকে নেক ও ভালর দিকে চালিত করা ইহা আল্লাহ পাকের কাজ। ইহাতে মানুষের কোন হাত নাই।

আমার উস্তাদ আবু আলী ফারমাদী (রহঃ) আমাকে বলিতেন, মুরীদের কর্তব্য হইল পীরের যথাযথ আদব রক্ষা করিয়া চলা এবং দ্বিমত পোষণ করিয়া পীরের কোন কথা মুখে বা অন্তরে অস্বীকার না করা। এই প্রসঙ্গে তিনি নিজের একটি ঘটনা উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন, একবার আমি আমার পীর হযরত আবুল কাসেম গিরগানীর নিকট আরজ করিলাম, আমি স্বপ্নে দেখিয়াছি, আপনি আমাকে কোন বিষয়ে হুকুম দিবার পর আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, উহা এইরূপ হওয়ার কারণ কি? এই ঘটনার পর দীর্ঘ এক মাস পর্যন্ত তিনি আমার উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন। পরে একদিন তিনি আমাকে বলিলেন, আমার কোন

কথার ব্যাপারে যদি তোমার কোন আপত্তি না থাকিত, তবে স্বপ্নযোগে কখনো এইরূপ আপত্তি করিতে না।

প্রকৃতপক্ষেও আমার শায়েখের ধারণা সঠিক ছিল। কারণ, এমন ঘটনাক্রম খুব কমই হইয়া থাকে যে, জাগ্রত অবস্থায় মানুষের অন্তরে যেই হালাত প্রবল থাকে, নিদ্রাবস্থায় উহার বিপরীত স্বপ্ন দেখিতে পায়।

উপস্থাপিত আলোচনার আলোকে এই বিষয়ে স্পষ্ট ধারণা পাওয়া গেল যে, অমঙ্গলজনক মৃত্যু হইতে পরিপূর্ণ নিরাপদ হওয়ার উপায় হইল– সংশয়হীনভাবে যাবতীয় বিষয়ের হাকীকত অবগত হইয়া সারা জীবন এমনভাবে আল্লাহর আনুগত্য করা, যেন গোনাহ কখনো স্পর্শ করিতে না পারে।

সুতরাং হে ভাইসকল! তোমরা যদি এই কথা বিশ্বাস কর যে, সকল বিষয়ের হাকীকত পরিপূর্ণভাবে ওয়াকেফ হওয়া এবং গোটা জীবন বেগোনাহ অবস্থায় আল্লাহর আনুগত্য করা– ইহা মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে, তবে তো অমঙ্গলজনক মৃত্যুর খওফ না করিয়া কোন উপায় নাই। আল্লাহর আরেফগণের অন্তরে সর্বদা এই খওফ প্রবল থাকিত। কারণ মৃত্যুর সময় যদি মানুষের কলবের হালাত ঠিক না থাকে, তবে সারা জীবনের আমল বরবাদ হইয়া যাইবে।

মাতরাফ বিন আব্দুল্লাহ বলিতেন, আমি এই বিষয়ে আশ্চর্যবোধ করি না যে, ধ্বংসপ্রাপ্ত ব্যক্তি কেমন করিয়া ধ্বংস হইল। বরং আমি এই বিষয়ে বিস্ময় বোধ করি যে, নাজাতপ্রাপ্ত ব্যক্তি কেমন করিয়া নাজাত পাইল।

হামেদ লাফফাফ বলেন, মোমেন বান্দার শুভ মৃত্যু হওয়ার পর ফেরেশতাগণ যখন তাহার রূহ লইয়া আকাশে গমন করে তখন তাহারা সবিস্ময়ে মন্তব্য করে, এই ব্যক্তি কেমন করিয়া দুনিয়া হইতে রক্ষা পাইল? অথচ আমাদের মধ্যে অনেকেই বিপথগামী হইয়া গিয়াছে।

একদা হযরত সুফিয়ান ছাওরী কাঁদিতেছিলেন। লোকেরা তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কাঁদিতেছেন কেন? জবাবে তিনি বলিলেন, কিছু দিন আমি গোনাহের কারণে কাঁদিয়াছি। এখন আমি ইসলামের জন্য কাঁদিতেছি। কারণ, আমার আশংকা হইতেছে, ইসলামের উপর আমার মৃত্যু হইবে কিনা।

সারকথা হইল, সাগর বক্ষের প্রচণ্ড জল-ঘুর্ণয়নে নৌকা পতিত হওয়ার পর সাগরের উত্তাল তরঙ্গ উহাকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইবে উহার কোন ঠিক-ঠিকানা নাই। এমতাবস্থায় আরোহীর পক্ষে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত হইতে

রক্ষা পাওয়ার সম্ভাবনা থাকে খুবই ক্ষীণ। মৃত্যুর ব্যাপারে মোমেন বান্দার অন্তর সেই বিপন্ন আরোহী অপেক্ষা আরো অধিক পেরেশান ও শঙ্কিত থাকে। এই সময় তাহার মনের ওয়াসওয়াসার তরঙ্গ বিপন্ন আরোহীর সমুদ্র তরঙ্গের আঘাত অপেক্ষা আরো অধিক যন্ত্রনাদায়ক হয়। তাহার খওফ ও আশঙ্কার কারণ থাকে একটিই– মৃত্যুর সময় মনে কোন অনিষ্টকর খেয়াল চাপিয়া বসে কিনা।

এই প্রসঙ্গেই রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন– মানুষ পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত বেহেশতবাসীদের ন্যায় আমল করে। এমনকি বেহেশত ও তাহার মাঝে এই পরিমাণ ব্যবধান থাকে, যেমন দুধ দোহন করার সময় দুই টানের মধ্যবর্তী সময়। কিন্তু তাহার মৃত্যু এমন অবস্থায় হয়, যাহা তাহার জন্য পূর্বে লেখা ছিল।

দুধ দোহন করার সময় দুই টানের মধ্যবর্তী সময় এমন পর্যাপ্ত নহে যে, ঐ সময়ের মধ্যে এমন কোন আমল করা যাইবে যাহা দুর্ভাগ্যের কারণ হইতে পারে। বরং এই মুহূর্তকালের মধ্যে অন্তরে ওয়াসওয়াসা আসিতে পারে যাহা বিদ্যুতের মতই আসিয়া উদয় হয়।

হযরত ছহল তশতরী (রহঃ) বলেন, একদা আমি স্বপ্নে দেখিলাম, যেন আমি জান্নাতে প্রবেশ করিয়াছি এবং সেখানে তিনশত পয়গম্বরের সঙ্গে আমার সাক্ষাত হইয়াছে। আমি তাঁহাদের সকলকে জিজ্ঞাসা করিলাম, দুনিয়াতে আপনারা কোন্ বিষয়টিকে সর্বাধিক ভয় করিতেন? তাঁহারা সকলে একই জবাব দিলেন– অমঙ্গলজনক মৃত্যুকে। এই ভয়ানক খওফ ও আশঙ্কার কারণেই স্বাভাবিক মৃত্যুর তুলনায় শাহাদাতের মৃত্যু উত্তম ও ঈর্ষনীয়। কারণ, স্বাভাবিক মৃত্যুর ক্ষেত্রে মনে অনিষ্টকর অবস্থা সৃষ্টি হওয়ার প্রবল আশঙ্কা থাকে। তবে বান্দার অন্তরে মারেফাতের নূর থাকিলে ঐ অবস্থা হইতে উত্তরণ সম্ভব হইবে।

শাহাদাতের ক্ষেত্রে এমন অবস্থায় রূহ কবজ হয় যে, তখন অন্তরে আল্লাহ পাকের মোহাব্বত ব্যতীত অপর কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। তখন অন্তর হইতে আওলাদ-ফরজন্দ, ধন-সম্পদ ইত্যাদির মোহাব্বত দূর হইয়া যায়। কারণ, যেই ব্যক্তি আল্লাহর মোহাব্বত ও তাঁহার সন্তুষ্টির অভিলাষী হয় এবং দুনিয়াকে আখেরাতের বিনিময়ে বিক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়, কেবল তাহার পক্ষেই যুদ্ধের ব্যূহে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়ানো সম্ভব হয়। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ

অর্থাৎ– আল্লাহ ক্রয় করিয়া লইয়াছেন মুসলমানদের নিকট হইতে তাহাদের

জান ও মাল এই মূল্যে যে, তাহাদের জন্য রহিয়াছে জান্নাত।

বলাবাহুল্য, মানুষ যেই জিনিস বিক্রয় করিয়া দেয় তাহার অন্তরে আর ঐ জিনিসের মোহাব্বত থাকে না। বরং ঐ বস্তুর বিনিময়ে যাহা ক্রয় করা হইয়াছে উহার মোহাব্বতই তাহার অন্তরে আসিয়া আসন গাড়ে। এই কারণেই মানুষ শাহাদাতের অভিলাষী হইয়া থাকে। কিন্তু গনীমতের মাল প্রাপ্তি কিংবা বীরত্ব ও খ্যাতি লাভ যাহার উদ্দেশ্য হয় তাহার পক্ষে রণাঙ্গণে প্রাণ দেওয়ার পরও শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করা সম্ভব হয় না।

ভাইসকল! অমঙ্গলজনক মৃত্যু এবং এই বিষয়ে যাহা যাহা আশঙ্কাজনক সেই সকল বিষয়ে ধারণা লাভ করিবার পর এখন তোমাদের কর্তব্য হইল– মৃত্যুর জন্য তৈয়ারী গ্রহণ করা এবং আল্লাহ পাকের স্মরণে মনোযোগী হওয়া। অন্তর হইতে দুনিয়ার ফিকির ও মোহাব্বত দূরীভূত করিয়া নিজেকে যাবতীয় পাপাচার হইতে হেফাজত করা। যথাসম্ভব পাপী লোকদের সাক্ষাত ও সঙ্গ পরহেজ করিয়া চলিবে। কারণ, ইহাও তোমার অন্তরে ক্রিয়া করিবে এবং উহার ফলে তোমার চিন্তা ও ফিকির আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তিত হইবে। এই ক্ষেত্রে কোন প্রকার অবহেলা ও টাল-বাহানা করিয়া এইরূপ বলিবে না যে, মৃত্যু ঘনাইয়া আসিবার পরই উহার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করিব। কারণ, মৃত্যু কখন আসিয়া হাজির হইবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। এমনও হইতে পারে যে, তোমার আজিকার এই কর্মটিই তোমার জীবনের শেষ কর্ম এবং উহার পরই তোমার ডাক আসিয়া পড়িবে। ইহা তো গেল জাগ্রত অবস্থার কথা। নিদ্রা গ্রহণের সময়ও নিজের জাহের-বাতেনকে পাক সাফ করিয়া আল্লাহর জিকিরের সহিত নিদ্রা গ্রহণ করিবে। আমাদের উদ্দেশ্য কেবল মৌখিক জিকির নহে। কারণ, নিছক মৌখিক জিকির খুব কমই তাছির করিয়া থাকে।

এই কথা নিশ্চিতভাবে জানিয়া রাখিবে যে, নিদ্রিত অবস্থায় মানুষের অন্তরে ঐ অবস্থাটিই প্রবল থাকে যাহা নিদ্রার পূর্বে প্রবল ছিল এবং স্বপ্নের মধ্যেও সেই অবস্থাটিই সক্রিয় থাকে যাহা জাগ্রত অবস্থায় সক্রিয় ছিল। অনুরূপভাবে নিদ্রা হইতে জাগ্রত হওয়ার পর মনকে সেই অবস্থাটিই আচ্ছন্ন করিয়া রাখে যাহা নিদ্রাবস্থায় গালেব ছিল। এখানে স্মরণ রাখিবে যে, নিদ্রা ও মৃত্যু পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ এবং নিদ্রা হইতে জাগ্রত হওয়া আর কেয়ামতের পুনরুত্থান এই দুইটি বিষয়ও পরস্পর সাদৃশ্যপূর্ণ। সুতরাং কলবের হালাতকে এমন পাক-সাফ রাখিবে যেন পরবর্তী হালাতে উহার প্রভাব থাকে।

এই কথা সত্য যে, সকল মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু যাহারা আলেম।

আলেমগণও ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু যাহারা আমেল (আমলকারী)। আমেলগণও ক্ষতিগ্রস্ত, কিন্তু যাহারা এখলাসওয়ালা। আর এখলাসওয়ালাগণ বড়ই খওফ ও আশংকাগ্রস্ত। এখন এই সকল বিষয় সকলের বুঝে আসিবে না। উহা উপলব্ধি করার একমাত্র ছুরত হইল, দুনিয়াতে কেবল জরুরত পরিমাণের উপর তুষ্ট থাকা। দুনিয়ার এই জরুরত হইল তিনটি বিষয়। অর্থাৎ অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান। এতদ্‌ব্যতীত পার্থিব জীবনে মানুষ আর যাহা কিছু করিতেছে, উহার সবই অপ্রয়োজনীয়। অন্ন বা খাওয়ার ক্ষেত্রে জরুরত পরিমাণ হইল, কেবল নিজেকে সোজা রাখা ও জীবন ধারণের জন্য যতটুকু প্রয়োজন সেই পরিমাণ খাবার গ্রহণ করা। আর এমনভাবে খাবার গ্রহণ করিবে যেন একান্ত নিরুপায় হইয়া অতীব অনীহার সহিত খাবার গ্রহণ করা হইতেছে। তাছাড়া খাওয়ার আগ্রহ যেন মল ত্যাগ করার আগ্রহের অতিরিক্ত না হয়। কারণ, খাবার দ্বারা পেট পূরণ এবং তথা হইতে উহার নিঃসরণ একই রকম। আর এই উভয় জরুরতই মানুষের স্বভাবজাত চাহিদার অন্তর্ভুক্ত। মল ত্যাগ করার সময় মানুষ যেমন এমন কামনা করে না যে, উহাতে যেন তাহার মনও নিবিষ্ট হইয়া যায়, অনুরূপভাবে খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারেও অতিরিক্ত মনোযোগী হওয়া ঠিক নহে। আহারের উদ্দেশ্য কেবল এতটুকুই হওয়া চাই যে, উহা দ্বারা যেন আল্লাহর এবাদতের শক্তি পাওয়া যায়– উহার অতিরিক্ত নহে। আহারের ক্ষেত্রে যদি তিনটি বিষয়কে সামনে রাখা হয় তবে উহা জরুরতের সীমার আওতায় থাকিবে। সেই তিনটি বিষয় এই– (ক) আহারের সময়, (খ) আহারের পরিমাণ, (গ) আহারের ধরণ। আহারের সময় হইল দিন ও রাতের মধ্যে কেবল এক বেলা আহার করিবে এবং নিয়মিত রোজা রাখার অভ্যাস করিবে। আহারের পরিমাণ হইল, পেটের এক তৃতীয়াংশ আহার দ্বারা পূরণ করিবে। কখনো এই পরিমাণের অতিরিক্ত আহার গ্রহণ করিবে না। আর আহারের ধরণ হইল সর্বদা মজাদার ও সুস্বাদু আহারের ফিকির করিবে না, বরং যখন যাহা যোগাড় হয় উহার উপরই তুষ্ট থাকিবে। সুতরাং হে ভাইসকল! তোমরা যদি এই তিনটি বিষয়ে অভ্যস্ত হইতে পারে, তবে সুস্বাদু আহারের ফিকির ও প্রবৃত্তির উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপন করিতে পারিবে এবং উহার ফলে কেবল হালাল খাবারের উপর তুষ্ট থাকা সম্ভব হইবে। কারণ, হালাল খাবার প্রথমতঃ অঢেল পাওয়া যায় না। দ্বিতীয়তঃ উহা দ্বারা প্রবৃত্তির যাবতীয় চাহিদা পূরণ হয় না। এই কারণেই নিজেকে হালালের উপর স্থির রাখা কিছুটা কষ্টকর হয় বটে, তবে নিজেকে "প্রয়োজন পরিমাণ" এর উপর অভ্যস্ত করিতে পারিলে হালালের উপর স্থির থাকা যাইবে।

অনুরূপভাবে লেবাসের ক্ষেত্রেও উদ্দেশ্য হওয়া চাই কেবল দেহের সতর পরিমাণ অংশ আবৃত রাখা এবং শীত-গরম হইতে রক্ষা পাওয়া, উহার অতিরিক্ত নহে। যেমন, এক পয়সার টুপী দ্বারা যদি মাথার শীত নিবারণ হয়, তবে উহার অতিরিক্ত ব্যয় করা হইলে উহা 'ফুজুল' বা 'অপ্রয়োজনীয়' বলিয়া গণ্য হইবে। দেহের অপরাপর পোশাকের ক্ষেত্রে এই উদাহরণের উপর কেয়াস করিয়া নিলেই চলিবে। এমনিভাবে বাসস্থান দ্বারাও যদি মূল উদ্দেশ্যের কথা বিবেচনা করা হয়, তবে তো মাথার উপর আবরণের জন্য আকাশরূপ ছাদ এবং শয়নের জন্য জমিনই যথেষ্ট। শীত বা গ্রীস্ম যদি প্রবল হয় তবে মসজিদের আশ্রয়ই যথেষ্ট হইতে পারে। পক্ষান্তরে তুমি যদি নিজের জন্য পৃথক বাড়ী নির্মাণ করিতে চাও, তবে এই চাহিদা পূরণ হওয়া খুবই দুষ্কর হইবে। তোমার গোটা জীবন উহার পিছনে ব্যয় করিয়া দিবার পরও হয়ত তোমার মর্জি মাফিক সেই চাহিদা পূরণ হইবে না। অথচ মানুষের এই ক্ষুদ্র জীবনই হইল পরকালের ছামান সংগ্রহ করার পূঁজি। কোন উপায়ে বাড়ী নির্মাণের যাবতীয় ছামান যোগাড় হইবার পর দেয়াল নির্মাণের ক্ষেত্রে তোমার উদ্দেশ্য যদি "মানুষের নিকট হইতে নিজেকে আড়াল করা" ব্যতীত অন্য কিছু হয় এবং রোদ-বৃষ্টি হইতে হেফাজত ব্যতীত ছাদ নির্মাণের পিছনে যদি অন্য কোন উদ্দেশ্যও জড়িত থাকে এবং তুমি যদি ছাদের সৌন্দর্য বর্ধ্বনের উদ্দেশ্যে উহাতে কারুকার্য স্থাপনে ব্যাপৃত হও; তবে ক্রমে তুমি এমন ভয়াবহ বিপর্যয়ে নিপতিত হইবে যে, উহা হইতে উদ্ধার পাওয়া তোমার জন্য দুষ্কর হইবে।

মোটকথা, তুমি যদি এইভাবে নিজেকে কেবল 'জরুরত পরিমাণ'-এর মধ্যে সীমিত রাখিতে পার, তবে নিজেকে আল্লাহর জন্য ফারেগ করিয়া মৃত্যু ও পরকালের প্রস্তুতি গ্রহণ করিতে পারিবে। পক্ষান্তরে তুমি যদি এই ক্ষেত্রে 'জরুরত'-এর সীমা অতিক্রম কর, তবে তোমার জীবনের মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হইবে এবং আল্লাহ পাক তোমাকে কোন্ অতলে নিয়া নিক্ষেপ করিবেন উহাতে তিনি কিছুমাত্র পরওয়া করিবেন না।

হে প্রিয়! এই নসীহত কবুল কর। যাহারা আল্লাহকে মোহাব্বত করেন, তাহারা তোমা অপেক্ষা এই নসীহতের অধিক মোহ্তাজ। স্মরণ রাখিও, এই সংক্ষিপ্ত ও ক্ষুদ্র জীবনই হইল আখেরাতের পথে অগ্রসর হওয়ার এবং পরকালের ছামান সংগ্রহ করার একমাত্র সুযোগ। এই সংক্ষিপ্ত জীবনের এক একটি দিন যদি তুমি অবহেলায় নষ্ট করিয়া দাও, তবে অসম্ভব নহে যে, হঠাৎ এক দিন এমন সময় তোমার দোরগোড়ায় মৃত্যু আসিয়া হাজির হইবে, যখন হয়ত মৃত্যুর জন্য তোমার প্রস্তুতি গ্রহণ সম্পন্ন হয় নাই। তখন তোমার অন্তরে এমন এক

নিদারুণ আক্ষেপ ও অনুশোচনা দেখা দিবে, যার কোন সীমা পরিসীমা নাই।

এতক্ষণ যাহা বলা হইল, তোমার অন্তরে খওফের স্বল্পতার কারণে উহার উপর আমল করা যদি তোমার পক্ষে সম্ভব না হয় এবং মৃত্যুকালীন অবস্থা সম্পর্কে যাহা লেখা হইল, উহা যদি তোমার অন্তরে খওফ সৃষ্টি করার জন্য যথেষ্ট না হয়, তবে এই পর্যায়ে আমরা খওফকারীগণের কিছু হালাত উল্লেখ করিতেছি। আমরা আশা করি, ইহা পাঠ করিলে তোমার অন্তরের কাঠিন্য দূর হইয়া তদস্থলে খওফ পয়দা হইবে। কারণ, তুমি তো ইহা ভাল করিয়াই জান যে, আল্লাহ পাকের নিকট আম্বিয়া (আঃ), আউলিয়া এবং আলেমগণের আকল-ছমঝ এবং তাঁহাদের আমল ও মর্যাদা তোমার আকল ও মর্যাদা অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। এখন ভাবিবার বিষয় হইল, এতসব কিছুর পরও তাঁহারা কি কারণে এত রোনাজারী ও পেরেশান হালে দিন গুজরান করিতেন? অনেক সময় তাঁহারা চিৎকার করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেন, কেহবা চৈতন্য হারাইয়া পড়িয়া থাকিতেন। এমনকি অনেকে খওফের প্রাবল্যের কারণে সহসা প্রাণ হারাইয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িতেন।

যাহারা সর্বদা গাফলতের মধ্যে পড়িয়া থাকে, তাহাদের অন্তর পাথর অপেক্ষা কঠিন হইয়া যায়। সুতরাং আম্বিয়া (আঃ) ও বুজুর্গানে দ্বীনের খওফের বিবরণ পাঠ করিলে তোমাদের অন্তরেও খওফ পয়দা হইবে। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ اَشَدُّ قَسْوَةً وَ اِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْاَنْهَار وَ اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءِ وَ اِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ وَ مَا اللّٰهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُوْنَ *

অর্থাৎ– তাহা পাথরের মত অথবা তদপেক্ষাও কঠিন। পাথরের মধ্যে এমনও আছে; যাহা হইতে ঝরণা প্রবাহিত হয়, এমনও আছে, যাহা বিদীর্ণ হয়, অতঃপর তাহা হইতে পানি নির্গত হয় এবং এমনও আছে যাহা আল্লাহ'র ভয়ে খসিয়া পড়িতে থাকে। আল্লাহ তোমাদের কাজ-কর্ম সম্পর্কে বেখবর নহেন।

হযরত আম্বিয়া (আঃ) ও ফেরেশতাগণের খওফের হালাত

হযরত আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, যখন ঝড়ো-হাওয়া প্রবাহিত হইত, তখন রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারা মোবারক বিবর্ণ হইয়া যাইত এবং তিনি দাঁড়াইয়া হুজরার ভিতর-বাহিরে পায়চারি করিতে থাকিতেন। আল্লাহ পাকের ভয়ের কারণেই তিনি এইরূপ করিতেন। একবার তিনি সূরা হাক্কার একটি আয়াত পাঠ করিয়া সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলেন। একবার তিনি হযরত জিবরাঈল (আঃ)-এর আকৃতি দেখিয়া চৈতন্য হারাইয়া ফেলেন। অন্য রেওয়ায়েতে আছে, রাসূল আকরম রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন নামাজে দাঁড়াইতেন, তখন তাঁহার বক্ষ মোবারক হইতে হাঁড়ীর বলকের মত শব্দ শোনা যাইত।

পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করিয়াছেন, আমার নিকট জিবরাঈল যখনই আগমন করিতেন, মহা পরাক্রমশালী আল্লাহর ভয়ে কম্পমান থাকিতেন।

বর্ণিত আছে যে, শয়তান যখন বিতাড়িত হইল, তখন হযরত জিবরাঈল ও মিকাঈল (আঃ) কাঁদিতে লাগিলেন। জিজ্ঞাসা করা হইল, তোমরা কাঁদিতেছ কেন? তাঁহারা আরজ করিলেন, এলাহী! আমরা আপনার আঘাত হইতে শংকামুক্ত নহি। আদেশ হইল– তোমরা এইরূপই থাক। অর্থাৎ– আমার আঘাত হইতে বে-খওফ ও নির্ভয় হইও না। মোহাম্মদ বিন মুনকাদির বর্ণনা করেন, দোজখ সৃষ্টি হওয়ার পর ভয়ে ফেরেশতাদের মন অস্থির হইয়া পড়িল। পরে বনী আদম সৃষ্টি হওয়ার পর তাহাদের মন স্থির হয়।

হযরত আনাস (রাঃ) হইতে বর্ণিত, রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি মিকাঈলকে কখনো হাসিতে দেখি না, ইহার কারণ কি? জবাবে হযরত জিবরাঈল (আঃ) বলিলেন, দোজখ সৃষ্টি হওয়ার পর হইতে তিনি কখনো হাসেন না।

অপর এক বর্ণনায় আছে– আল্লাহ পাকের কতক ফেরেশতা আগুন সৃষ্টি হওয়ার পর হইতে এই ভয়ে হাসেন না যে, আল্লাহ পাক আমাদের উপর ক্রোধান্বিত হইয়া ঐ আগুন দ্বারা আবার আমাদিগকে শাস্তি দেন কিনা।

হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, একবার আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে বাহির হইলাম। তিনি জনৈক আনসারীর বাগানে তাশরীফ লইয়া গেলেন এবং তথা হইতে খোরমা লইয়া খাইতে লাগিলেন। এই সময় তিনি আমাকে বলিলেন, তুমি খাইতেছ না কেন? আমি আরজ করিলাম, আমার খোরমা খাওয়ার ক্ষুধা নাই। তিনি ফরমাইলেন, আমার ক্ষুধা আছে এবং আজ আমার অনাহারের চতুর্থ দিবস। এই কয়দিন আমি আহার পাই নাই। আমি যদি আমার প্রতিপালকের নিকট চাহিতাম তবে তিনি আমাকে রোম ও পারস্য সাম্রাজ্য দান করিয়া দিতেন। হে ইবনে ওমর! তখন তোমার কি অবস্থা হইবে, যখন তুমি এমন লোকদের মধ্যে অবস্থান করিবে, যাহারা বৎসরের খোরাক সঞ্চয় করিয়া রাখিবে এবং তাহাদের ঈমান হইবে দুর্বল? হযরত ইবনে ওমর (রাঃ) বলেন, আমরা সেই বাগানেই ছিলাম, এমন সময় এই আয়াত অবতীর্ণ হইল–

وَكَاَيِّنْ مِّنْ دَآبَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اَللّٰهُ يَرْزُقُهَا وَاِيَّاكُمْ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

অর্থাৎ– অনেক জন্তু রহিয়াছে, যাহারা তাহাদের রুযী সঞ্চয় করে না। আল্লাহ তাহাদেরকে এবং তোমাদেরকে রুযী দান করেন। তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ।

রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ ফরমাইয়াছেন, আল্লাহ পাক তোমাদিগকে সম্পদ শোষণ করা এবং প্রবৃত্তির অনুসরণ করার আদেশ করেন নাই। যেই ব্যক্তি অস্থায়ী জীবনের জন্য দীনার জমা করে, তাহার জীবন আল্লাহর হাতেই। খবরদার! আমি দীনার ও দেরহাম জমা করিয়া রাখি না এবং আগামীকালের জন্য জীবনোপকরণ সঞ্চয় করিয়া রাখি না।

হযরত আবু দারদা (রাঃ) বর্ণনা করেন, হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন নামাজে দাঁড়াইতেন তখন তাঁহার বক্ষের স্ফুটন এক ক্রোশ দূর হইতেও শোনা যাইত।

হযরত মোজাহিদ (রহঃ) বলেন, হযরত দাউদ (আঃ) ক্রমাগত চল্লিশ দিন সেজদায় ক্রন্দন করিলেন এবং মস্তক উত্তোলন করিলেন না। ফলে তাঁহার চোখের পানিতে মাটি সিক্ত হইয়া সবুজ ঘাস গজাইয়া উঠিল এবং তাঁহার মস্তক আবৃত হইয়া গেল। এই পর্যায়ে গায়েবী আওয়াজ আসিল, হে দাউদ! তুমি অভুক্ত হইলে খাবার দেওয়া হইবে, তৃষ্ণার্ত হইলে পানি দেওয়া হইবে এবং বস্ত্রহীণ হইলে বস্ত্র দেওয়া হইবে। হযরত দাউদ (আঃ) সঙ্গে সঙ্গে চিৎকার করিয়া উঠিলেন। তাঁহার খওফের উত্তাপে কাষ্ঠ জ্বলিয়া গেল। অতঃপর আল্লাহ পাক তাঁহার জন্য তওবা ও মাগফেরাত নাজিল করিলেন। হযরত দাউদ (আঃ)

আরজ করিলেন, এলাহী! আমার গোনাহ আমার হাতে সমর্পণ করুন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার হাতে তাঁহার গোনাহ লিখিয়া দেওয়া হইল। অতঃপর তিনি যখন পানাহার করিতেন বা অন্য কোন কাজে হাত উঠাইতেন তখন ঐ গোনাহ দেখিয়া ক্রন্দন করিতেন।

বর্ণনাকারী বলেন, তাহার সম্মুখে যেই পানির পেয়ালা পেশ করা হইত, উহার এক তৃতীয়াংশ খালী রাখা হইত। অতঃপর তিনি যখন নিজের গোনাহ দেখিতেন, তখন ঐ পেয়ালায় ঠোঁট স্পর্শ করার পূর্বেই উহা তাঁহার অশ্রুতে পরিপূর্ণ হইয়া যাইত।

হযরত দাউদ (আঃ) সম্পর্কে এমনও বর্ণিত আছে যে, মৃত্যুর পূর্ব পর্যন্ত তিনি লজ্জার কারণে স্বীয় মস্তক আকাশের দিকে উত্তোলন করেন নাই। তিনি আল্লাহ পাকের দরবারে এইরূপ দোয়া করিতেন, আয় পরওয়ারদিগার! আমি যখন আমার গোনাহের দিকে দেখি, তখন তোমার এই সুবিশাল জমিন এত বিস্তৃত হওয়া সত্ত্বেও আমার নিকট উহা সংকীর্ণ মনে হইতে থাকে। পক্ষান্তরে যখন তোমার রহমতের কথা স্মরণ করি, তখন আমার আত্মায় প্রাণ আসে। পরওয়ারদিগার! তুমি পবিত্র। তোমার বান্দাগণের মধ্যে যাহারা চিকিৎসক; আমি তাঁহাদের নিকট আমার গোনাহের চিকিৎসার জন্য গিয়াছি, কিন্তু তাহারা সকলেই তোমার কথাই বলিয়াছেন। সুতরাং দুর্ভোগ সেই ব্যক্তির জন্য, যে তোমার রহমত হইতে নিরাশ হয়।

হযরত ফোজায়েল বর্ণনা করেন, আমার নিকট এই রেওয়ায়েত পৌঁছিয়াছে যে, এক দিন হযরত দাউদ (আঃ) নিজের গোনাহের কথা স্মরণ করার মুহূর্তে স্বীয় মস্তকে হস্ত স্থাপনপূর্বক সজোরে চিৎকার করিয়া পাহাড়ের দিকে ছুটিয়া গেলেন। সেখানে হিংস্র প্রাণীরা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া জমায়েত হইলে তিনি উহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, তোমরা আমার সম্মুখ হইতে চলিয়া যাও, তোমাদের সঙ্গে আমার কোন প্রয়োজন নাই। যাহারা নিজেদের অপরাধের জন্য ক্রন্দন করে, আমি তো তাহাদিগকেই কামনা করি, যেন তাহাদের দেখাদেখি আমারও কান্না আসে। সুতরাং যাহারা গোনাহগার নহে, তাহাদের উপস্থিতি আমার কাম্য নহে।

হযরত দাউদ আলাইহিস্সালামকে যখন কেহ অতিরিক্ত রোনাজারী করিতে বারণ করিতেন, তখন তিনি বলিতেন, আমাকে ক্রন্দন করিতে দাও, সেই দিন আসার পূর্বে, যেই দিন এই ক্রন্দনের সুযোগ শেষ হইয়া যাইবে এবং হাড়সমূহ জ্বলিয়া যাইবে।

হযরত ইয়াজীদ রোকাশী (রহঃ) বর্ণনা করেন, একদা হযরত দাউদ (আঃ) চল্লিশ হাজার মানুষ লইয়া পথে বাহির হইলেন। অতঃপর তাহাদিগকে এক জায়গায় জমায়েত করিয়া আল্লাহ পাকের আজাব ও গজবের ওয়াজ শোনাইলেন। ঐ ওয়াজ শুনিয়া খওফের অতিশয্যে ঘটনাস্থলেই ত্রিশ হাজার মানুষ মৃত্যুবরণ করিল। পরে তিনি দশ হাজার মানুষ লইয়া তথা হইতে ফেরৎ আসিলেন।

হযরত দাউদ (আঃ)-এর দুইজন দাসী ছিল। তাহাদের দায়িত্ব ছিল, তিনি যখন আল্লাহর ভয়ে মাটিতে পড়িয়া তড়পাইতে থাকিতেন তখন তাহারা হযরতের হাত, পা ও বুকের উপর চাপিয়া বসিত, যেন তাঁহার দেহের জোড়াসমূহ আগল হইয়া তিনি মৃত্যুবরণ না করেন।

হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর হালাত

হযরত ইবনে ওমর রাজিয়াল্লাহু আনহু বলেন, হযরত জাকারিয়া (আঃ)-এর ছেলে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) মাত্র আট বৎসর বয়সে বাইতুল মোকাদ্দাস তাশরীফ লইয়া যান। তথায় তিনি দেখিতে পাইলেন, মসজিদে অবস্থানরত আবেদগণ পশমী কাপড় পরিধান করিয়া আছেন। আবেদগণের মধ্যে যিনি সবচাইতে বেশী মেহনত-মোশাক্কাত করিতেছিলেন, তাহার অবস্থা ছিল– তিনি নিজেই নিজের গলার হাড় চিরিয়া উহাতে একটি শিকল বাঁধিয়া উহার অপর প্রান্ত দ্বারা মসজিদের এক কোণায় নিজেকে বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন। এই দৃশ্য দেখিয়া হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) মনে মনে বড় শঙ্কিত হইলেন। অতঃপর তিনি স্বীয় মাতাপিতার নিকট ফিরিয়া আসিলেন। বাড়ী ফিরার সময় তিনি পথে কতিপয় বালককে খেলা করিতে দেখিলেন। বালকরা তাহাকেও সেই খেলায় যোগ দিতে আমন্ত্রণ জানাইয়া বলিল, আমাদের সঙ্গে খেলা করিতে আস। জবাবে তিনি বলিলেন, দুনিয়াতে আমাকে খেলা করার জন্য সৃষ্টি করা হয় নাই। বাড়ীতে আসিয়া তিনি স্বীয় মাতাপিতাকে বলিলেন, আমাকে পশমের জামা তৈরী করিয়া দিন। ছেলের কথা অনুযায়ী তাহাকে সেই জামা বানাইয়া দিলে তিনি উহা পরিধান করিয়া বাইতুল মোকাদ্দাসে চলিয়া গেলেন।

বর্ণনাকারী বলেন, হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) ক্রমাগত পনের বৎসর নিয়মিত বাইতুল মোকাদ্দাসে অবস্থান করেন। পরে তিনি তথা হইতে বাহির হইয়া পাহাড়-পর্বতে চলিয়া গেলেন।

এদিকে তাহার মাতাপিতা তাঁহাকে সন্ধান করিয়া ফিরিতে লাগিলেন।

একদিন হঠাৎ তাঁহারা দেখিতে পাইলেন, হযরত ইয়াহ্ইয়া আরদান নদীর কূলে বসিয়া পা ভিজাইতেছেন আর প্রচণ্ড পিপাসার তাড়নায় যেন তাহার প্রাণ বাহির হইয়া যাওয়ার উপক্রম হইতেছে। এই সময় তিনি চিৎকার করিয়া বলিতেছিলেন, তোমার ইজ্জত ও বুজুর্গীর কসম! যতক্ষণ না আমি এই কথা জানিতে পারিব যে, তোমার নিকট আমার পরিণতি কি হইবে ততক্ষণ আমি ঠাণ্ডা পানি পান করিব না। তাঁহার পিতামাতার সঙ্গে জবের রুটি ছিল। উহা বাহির করিয়া ছেলেকে দিয়া বলিলেন, ইহা খাইয়া পানি পান কর। হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ) পিতামাতার নির্দেশ পালন করিলেন এবং নিজের কসমের কাফ্ফারা দিলেন। এই কারণেই আল্লাহ পাক তাঁহার প্রশংসায় বলিয়াছেন– برا بوالديه – এবং স্বীয় পিতামাতার (একনিষ্ঠ) সেবক।

মোটকথা, তাঁহারা হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)-কে ফিরাইয়া আনিলেন। পরবর্তীতে তাঁহার নিয়মিত অবস্থা ছিল এইরূপ– তিনি যখন নামাজে দাঁড়াইতেন তখন তিনি এমনভাবে রোদন করিতেন যে, তাঁহার অবস্থা দেখিয়া আশেপাশের গাছ এবং উহার পাতাও রোদন করিতে থাকিত। হযরত ইয়াহ্ইয়ার কান্না দেখিয়া হযরত জাকারিয়া (আঃ)-ও এত কান্না করিতেন যে, অবশেষে তিনি সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিতেন। পরবর্তীতে হযরত ইয়াহ্ইয়া (আঃ)-এর এমন অবস্থা হইল যে, ক্রমাগত কান্নার কারণে তাঁহার চেহারার গোশত খসিয়া চোয়াল বাহির হইয়া পড়িল।

এক দিন তাঁহার মাতা বলিলেন, বেটা! তুমি যদি সম্মত হও, তবে আমি তোমার মুখের চোয়াল মানুষের নজর হইতে ঢাকিয়া রাখার ব্যবস্থা করিব। তিনি সম্মতি জ্ঞাপন করিলে তাঁহার মা দুই খণ্ড তুলা ভাজ করিয়া ছেলের দুই গালে লাগাইয়া দিলেন। কিন্তু তিনি নামাজে দাঁড়াইলে চোখের পানিতে ভিজিয়া উহা যখন পুনরায় খসিয়া পড়ার উপক্রম হইত, তখন তাঁহার স্নেহময়ী মাতা পুনরায় উহা নিংড়াইয়া যথাস্থানে লাগাইয়া দিতেন। এই সময় তিনি স্বীয় মাতার অশ্রুসিক্ত হাতের দিকে তাকাইয়া আল্লাহ পাকের দরবারে আরজ করিতেন, এলাহী! ইনি আমার মা, তাঁহার হাতে আমার চোখের পানি আর তুমি আরহামুর রাহেমীন।

একদিন হযরত জাকারিয়া (আঃ) নিজের ছেলেকে বলিলেন, আমি তো আল্লাহ পাকের দরবারে এই দোয়াই করিয়াছিলাম, যেন তুমি আমার চক্ষু শীতলকারী হও। অথচ তুমি দিন-রাত শুধু ক্রন্দন করিতে থাক। তোমার এই অবস্থা দেখিয়া আমি কেমন করিয়া শান্তি পাই বল? জবাবে তিনি বলিলেন,

আব্বাজান! হযরত জিবরাঈল (আঃ) আমাকে বলিয়াছেন, জান্নাত ও জাহান্নামের মধ্যবর্তী স্থানে একটি মাঠ আছে, রোদনকারী ব্যতীত অপর কেহ উহা অতিক্রম করিতে পারিবে না। এই কথা শুনিয়া হযরত জাকারিয়া (আঃ) বলিলেন, বেটা! আমার দিল এতমিনান হইয়া গিয়াছে। এখন তোমার যত ইচ্ছা রোদন কর।

হযরত ইবরাহীম (আঃ)-এর খওফ

বর্ণিত আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ) যখন নিজের অপরাধের কথা স্মরণ করিতেন, তখন সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিতেন। এই সময় তাঁহার বক্ষে যেই স্পন্দন সৃষ্টি হইত উহা বহু দূর হইতে মানুষ শুনিতে পাইত। একদা ঐ অবস্থায় হযরত জিবরাঈল (আঃ) তাঁহার খেদমতে আসিয়া আরজ করিলেন, আল্লাহ পাক আপনাকে ছালাম জানাইয়া বলিয়াছেন, আপনি কি কখনো এমন দেখিয়াছেন যে, কোন বন্ধু তাহার বন্ধুকে ভয় করে? জবাবে হযরত ইবরাহীম (আঃ) ফরমাইলেন, হে জিবরাঈল! আমি যখন আমার ত্রুটির কথা স্মরণ করি, তখন বন্ধুত্বের কথা ভুলিয়া যাই।

ছাহাবা ও তাবেয়ীগণের মধ্যে আল্লাহর খওফের প্রাবল্য

বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর ছিদ্দিক একদা একটি পাখী দেখিয়া উহাকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, হায়! আমি যদি মানুষ না হইয়া তোমার মত পাখী হইতাম, তবে কতইনা ভাল হইত। অনুরূপভাবে হযরত আবু যর (রাঃ) আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, হায়! আমি যদি কোন বৃক্ষ হইতাম আর উহা কাটিয়া ফেলা হইত, তবে উহাই ছিল আমার জন্য উত্তম। হযরত ওসমান (রাঃ) বলিতেন, আমার নিকট ইহাই উত্তম মনে হয় যেন মৃত্যুর পর আর আমার পুনরুত্থান না হয়। হযরত আয়েশা (রাঃ) বলেন, আমার নিকট ইহাই ভাল মনে হয় যেন বিস্মৃতির অতলে নিমজ্জিত হইয়া যাই।

হযরত ওমর (রাঃ)-এর খওফ

হযরত ওমর (রাঃ) যখন কালামে পাকের কোন আয়াত শুনিতেন তখন খওফের কারণে চৈতন্য হারাইয়া পড়িয়া যাইতেন। অতঃপর রীতিমত তাঁহার

চিকিৎসা করিতে হইত। একদিন তিনি একটি তৃণ হাতে লইয়া বলিলেন, হায়! আমি যদি এমন একটি তৃণ হইতাম তবে কতইনা ভাল হইত। হায়! আমি যদি কোন আলোচিত ব্যক্তি না হইয়া কোন অখ্যাত মানুষ হইতাম, আমার মাতা যদি আমাকে জন্মই না দিতেন।

অধিক অশ্রু প্রবাহের কারণে হযরত ওমর (রাঃ)-এর চেহারায় দুইটি দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। তিনি বলিতেন, যেই ব্যক্তি আল্লাহকে খওফ করে, সে কখনো কোন বিষয়ে রাগ করিতে পারে না। যেই ব্যক্তি তাকওয়া ও পরহেজগারী এখতিয়ার করিবে সে কখনো 'মন যাহা চাহে তাহাই' করিয়া বেড়াইতে পারে না। তিনি বলেন, যদি কেয়ামত কায়েম না হইত, তবে পৃথিবীর এই দৃশ্যপট পাল্টাইয়া যাইত।

হযরত ওমর (রাঃ) সূরা কুওইরাত পাঠ করিতে করিতে যখন নিম্নের আয়াতটি পাঠ করিতেন, তখন সংজ্ঞা হারাইয়া পড়িয়া যাইতেন। আয়াতটি এই–

وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ

অর্থাৎ– যখন আমলনামা খোলা হইবে।

হযরত ওমর (রাঃ) একদিন একটি বাড়ীর নিকট দিয়া কোথায় যাইতেছিলেন। তিনি শুনিতে পাইলেন, বাড়ীর ভিতরে কেহ নামাজের মধ্যে সূরা তূর তেলাওয়াত করিতেছে। তিনি সেখানেই দাঁড়াইয়া সেই তেলাওয়াত শুনিতে লাগিলেন। লোকাটি যখন নিম্নের আয়াতটি পাঠ করিল–

إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ مَا لَهُ مِنْ دَافِعٍ

অর্থাৎ– "আপনার পালনকর্তার শাস্তি অবশ্যম্ভাবী। তাহা কেহ প্রতিরোধ করিতে পারিবে না।" তখন হযরত ওমর (রঃ) সওয়ারী হইতে অবতরণ করিয়া পাশের একটি দেয়ালে হেলান দিয়া বসিয়া পড়িলেন। ঐ অবস্থায় কিছু সময় অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন।

উপরোক্ত ঘটনার পর তিনি ক্রমাগত এক মাস অসুস্থ ছিলেন। লোকেরা তাঁহার সেবা-চিকিৎসা করিতে লাগিল। কিন্তু কেহই এই কথা জানিতে পারিল না যে, তিনি কি কারণে এবং কেমন করিয়া অসুস্থ হইলেন।

হযরত আলী (রাঃ)-এর খওফ

হযরত আলী (রাঃ) একদিন আক্ষেপ করিয়া বলিলেন, আমি রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ছাহাবীগণকে দেখিয়াছি। কিন্তু আজ তাঁহাদের মত কিছুই দেখিতে পাইতেছি না। এলোমেলো কেশ ও ধুলা-মলিন থাকাই ছিল তাঁহাদের অভ্যাস। তাঁহাদের ললাটে সেজদার দাগ পড়িয়া গিয়াছিল। রাতে তাঁহারা সেজদা ও কেয়ামের হালাতে কাটাইতেন। পদযুগল ও কপালের উপর পালাক্রমে ভর দিতেন এবং কোরআন তেলাওয়াত করিতেন। প্রবল বাতাসে বৃক্ষ যেমন আন্দোলিত হয়, প্রভাতে ঠিক তেমনি তাঁহারা কাঁপিতে থাকিতেন। তাঁহাদের চোখ হইতে এত অশ্রু নির্গত হইত যে, উহার ফলে তাঁহাদের পরিধেয় বস্ত্র সিক্ত হইয়া যাইত। কিন্তু আজ আমি এমন লোকদের মাঝে অবস্থান করিতেছি, রাতের আধারে যাহারা অতিশয় নিদ্রায় আচ্ছন্ন হইয়া থাকে। অতঃপর তিনি দাঁড়াইয়া যাইতেন। এই বয়ানের পর তাঁহাকে কখনো হাসিতে দেখা যায় নাই।

খওফের আরো বিবরণ

এমরান বিন হুছাইন বলেন, ভস্ম হইয়া বাতাসে উড়িয়া যাওয়া আমি নিজের জন্য উত্তম মনে করি। হযরত আবু ওবায়েদ বিন জাররাহ বলেন, আমি যদি ভেড়া হইতাম এবং আমার পরিবারের লোকেরা যদি আমাকে জবাই করিয়া ফেলিত, তবে উহাই আমার জন্য উত্তম ছিল।

হযরত ইমাম জয়নুল আবেদ্বীন যখন অজু করিতে বসিতেন তখন তাহার চেহারা রক্তিম বর্ণ হইয়া যাইত। পরিবারের লোকেরা জিজ্ঞাসা করিত, অজু করার সময় আপনার এইরূপ অবস্থা হয় কেন? জবাবে তিনি বলিতেন, তোমরা কি জান না যে, আমি কাহার সম্মুখে দাঁড়াইতে যাইতেছি? মূসা বিন মাসউদ বলেন, আমরা যখন সুফিয়ান ছাওরীর নিকট বসিতাম তখন তাঁহার খওফের অবস্থা দেখিয়া মনে হইত যেন, আগুন চতুর্দিক হইতে আমাদিগকে বেষ্টন করিয়া আছে।

মেসওয়ার ইবনে মাখরামা আল্লাহ'র খওফের কারণে কালামে পাকের তেলাওয়াত শুনিতেই পারিতেন না। ঘটনাক্রমে যদি কখনো কালামে পাকের কোন শব্দ বা আয়াত তাহার কানে প্রবেশ করিত, তবে সঙ্গে সঙ্গে তিনি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া যাইতেন এবং ক্রমাগত কয়েক দিন তাহার জ্ঞান ফিরিয়া আসিত না। এক দিন খাছআম গোত্রের এক ব্যক্তি তাহার নিকট আগমন করিয়া নিম্নের

আয়াতটি তেলাওয়াত করিল—

يَوْمَ نَحْشُرُ الْمُتَّقِيْنَ اِلَى الرَّحْمٰنِ وَفْدًا وَّ نَسُوْقُ الْمُجْرِمِيْنَ اِلٰى جَهَنَّمَ وِرْدًا

অর্থাৎ— সেই দিন দয়াময়ের নিকট পরহেজগারদিগকে অতিথিরূপে সমবেত করিব এবং অপরাধীদিগকে পিপাসার্ত অবস্থায় জাহান্নামের দিকে হাঁকাইয়া লইয়া যাইব।

উপরোক্ত আয়াত শুনিয়া তিনি নিজের সম্পর্কে মন্তব্য করিলেন, আমি তো অপরাধীদের অন্তর্ভুক্ত; আমি পরহেজগার নহি। অতঃপর তিনি লোকটিকে পুনরায় ঐ আয়াত তেলাওয়াত করিতে বলিলেন। লোকটি আবারো ঐ আয়াত তেলাওয়াত করিলে তিনি সঙ্গে সঙ্গে বিকট স্বরে চিৎকার করিয়া সহসা প্রাণ ত্যাগ করিলেন।

হযরত ইয়াহইয়া (রঃ) আল্লাহর ভয়ে সর্বদা কান্না করিতেন। একদিন তাহার সম্মুখে কেহ নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করিল—

وَلَوْ تَرٰى اِذْ وُقِفُوْا عَلٰى رَبِّهِمْ

অর্থাৎ— তাহাদের রবের সামনে তাহাদের দাঁড় করানোর দৃশ্যটি যদি আপনি দেখিতেন।

উপরোক্ত আয়াত শোনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি এমন বিকট স্বরে চিৎকার করিয়া উঠিলেন যে, অতঃপর দীর্ঘ চার মাস তিনি অসুস্থ অবস্থায় পড়িয়াছিলেন। বসরার আশপাশ হইতে বহু লোক তাহার সেবা শুশ্রূষা করার জন্য আসিয়াছিল।

প্রখ্যাত বুজুর্গ হযরত মালেক বিন দীনার বলেন, একবার আমি খানায়ে কা'বার তাওয়াফ করিতেছিলাম। এমন সময় আমি দেখিতে পাইলাম, এক যুবতী নারী কাবার গিলাফ ধরিয়া বলিতেছে, আয় পরওয়ারদিগার! জীবনের বহু ভোগ বিলাস অতিক্রম করিয়া আসিয়াছি। এখন উহার আজাবের অপেক্ষা করিতেছি। আয় রব! তোমার নিকট দোজখ ব্যতীত অপর কোন শাস্তির বিধান নাই কি? এই কথা বলিয়া সে আরো অধিক মাত্রায় রোদন করিতে লাগিল। এমনিভাবে সে ভোর পর্যন্ত বিরামহীনভাবে রোদন করিল। মেয়েটির হালাত দেখিয়া আমি নিজের অবস্থার উপর আক্ষেপ করিয়া চিৎকার দিয়া উঠিলাম।

বর্ণিত আছে যে, আরাফার দিন মানুষ যখন আল্লাহর দরবারে দোয়া করিতেছিল, তখন হযরত ফোজাইল ফোঁপাইয়া কান্না করিতেছিলেন। যখন সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল তখন তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া আল্লাহ'র দরবারে আরজ করিলেন, তুমি যদি আমাকে ক্ষমা করিয়াও দাও; তথাপি

তোমার দরবারে হাজির হইতে আমার লজ্জাবোধ হইবে।

হযরত আব্বাস (রাঃ)-কে খওফকারীর স্বরূপ জিজ্ঞাসা করা হইলে তিনি বলিলেন, যাহার অন্তর খওফের কারণে উদ্বিগ্ন এবং চোখ কান্নারত, সেই ব্যক্তিই খওফকারী। তিনি আরো বলেন, এমন অবস্থায় কেহ কি উৎফুল্ল থাকিতে পারে যে, মৃত্যু পশ্চাৎ দিক হইতে ধাওয়া করিতেছে, সামনে কবরের ভয়াবহ ঘাঁটী, কেয়ামতের আগমন অবশ্যম্ভাবী, দোজখের উপর দিয়া পথ অতিক্রম করিতে হইবে এবং সর্বোপরী আল্লাহ পাকের সম্মুখে আমাদিগকে হাজির হইতে হইবে।

একদা হযরত হাসান বসরী (রহঃ) কোথাও যাইতেছিলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন, এক জায়গায় কতিপয় লোক বসিয়া আছে এবং তাহাদের মধ্যে এক যুবক অতিমাত্রায় হাস্য করিতে করিতে গড়াইয়া পড়িতেছে। হযরত হাসান যুবকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া শান্তভাবে তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে যুবক! তুমি কি পুলসিরাত অতিক্রম করিয়াছ? সে বলিল, না। তিনি আবার জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি কি বলিতে পার, তুমি জান্নাতে যাইবে, না জাহান্নামে যাইবে? যুবক আরজ করিল, এই বিষয়ে আমার কিছুই জানা নাই। এইবার হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলিলেন, তবে তুমি কেমন করিয়া হাস্য করিতেছ?

বর্ণনাকারী বলেন, উপরোক্ত ঘটনার পর সেই যুবককে জীবনে আর কখনো হাসিতে দেখা যায় নাই।

হযরত হাম্মাদ এমনভাবে উপবেশন করিতেন যেন অর্ধেক দাঁড়াইয়া আছেন এবং অর্ধেক বসিয়া আছেন। এই সময় যদি তাহাকে কেহ বলিত যে, আরাম করিয়া বসুন, তখন তিনি জবাব দিতেন, আরাম করিয়া বসিতে পারে সেই ব্যক্তি যাহার অন্তরে কোন আশঙ্কা নাই। আমি সর্বদা আল্লাহ পাকের নাফরমানীর খওফে শঙ্কিত। সুতরাং আমি কিভাবে আরাম করিয়া বসিব?

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ বলেন, আল্লাহ তায়ালা নিজ বান্দাদিগকে গাফলতের মধ্যে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন– ইহাও তাঁহার রহমত বটে। অন্যথায় আল্লাহর ভয়ে সকলের মৃত্যু ঘটিত।

হযরত মালেক বিন দীনার (রহঃ) বলেন, আমি এমন ইচ্ছা করিতেছি যে, মৃত্যুর সময় আমি উপস্থিত লোকজনকে বলিয়া দিব, যেন মৃত্যুর পর আমাকে বেড়ী পরাইয়া শৃঙ্খলিত অবস্থায় আল্লাহর দরবারে হাজির করা হয়– যেমন কোন পলাতক গোলামকে পাকড়াও করিয়া তাহার মনিবের সম্মুখে লইয়া যাওয়া হয়।

অন্য এক বুজুর্গ বলেন, আমি দিনের মধ্যে কয়েকবার আমার চেহারা পরীক্ষা করিয়া দেখি যে, আল্লাহর নাফরমানীর কারণে আমার চেহারার রং পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে কি-না।

আবু হাফস্ (রহঃ) বলেন, দীর্ঘ চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত এই বিশ্বাস ছিল যে, আল্লাহ পাক আমাকে গজবের দৃষ্টিতে দেখিতেছেন এবং আমার আমলও ঐ বিশ্বাসেরই সমর্থন করিতেছে।

মোহাম্মদ বিন কা'ব আল কুরজীর জননী তাহাকে বলিলেন, বেটা! আমি তোমাকে জানি। তুমি শৈশবেও নেক ও পবিত্র ছিলে এবং বড় হইয়াও ভাল আছ। এবাদত-বন্দেগীতে তুমি রাত দিন এত মেহনত করিতেছ যে, ইহা তোমার স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর হইতে পারে। তুমি কি কারণে এত পরিশ্রম করিতেছ?

জবাবে তিনি বলিলেন, হে স্নেহময়ী মাতা! আল্লাহ পাক যদি আমাকে কোন গোনাহ করিতে দেখিয়া আমার উপর অসন্তুষ্ট হইয়া এই কথা বলিয়া ফেলেন যে, "আমার ইজ্জত ও জালালের কসম, আমি তোমাকে ক্ষমা করিব না।"– তবে এই আশঙ্কা হইতে নির্ভয় হওয়ার কোন উপায় আছে কি?

হযরত ফোজায়েল (রহঃ) বলেন, কোন প্রেরিত পয়গম্বর, নৈকট্যশীল ফেরেশতা কিংবা কোন নেক মানুষের প্রতি আমার কোন ঈর্ষা নাই। কারণ কেয়ামতের দিন তাহাদের উপর কোন আজাব হইবে না। আমার ঈর্ষা কেবল সেই ব্যক্তির প্রতি, যেই ব্যক্তি জন্মগ্রহণই করে নাই।

জনৈক আনসারী যুবক সর্বদা দোজখের আজাবের ভয়ে ক্রন্দন করিত এবং কখনো ঘর হইতে বাহির হইত না। এক দিন পেয়ারা নবী ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুবকের ঘরে গমন করিয়া নিজের গলার সঙ্গে তাহাকে জড়াইয়া ধরিলেন। কিন্তু আল্লাহ পাকের কি শান, যুবক সঙ্গে সঙ্গে প্রাণ ত্যাগ করিয়া মাটিতে লুটাইয়া পড়িল। রাসূল ছাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছাহাবায়ে কেরামকে বলিলেন, তোমাদের এই সঙ্গীটির কাফন-দাফনের ব্যবস্থা কর। দোজখের ভয় তাহার কলিজাকে টুকরা টুকরা করিয়া দিয়াছে।

ইবনে আবী মায়সারা শয্যা গ্রহণের সময় বলিতেন, হায়! আমার মাতা যদি আমাকে প্রসব না করিতেন। তাহার মাতা একদিন তাহাকে বলিলেন, হে মায়সারা! আল্লাহ পাক তো তোমার উপর এই অনুগ্রহ করিয়াছেন যে, তোমাকে মুসলমান বানাইয়া পয়দা করিয়াছেন। সুতরাং তোমার এত ভয়ের কারণ কি?

জবাবে তিনি বলিলেন, আল্লাহ পাক আমার উপর অনুগ্রহ করিয়াছেন, এই বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তিনি বলিয়াছেন, আমরা সকলে দোজখে যাইব, দোযখ হইতে বাহির হওয়ার কথা বলেন নাই। আমার ভয়ের কারণ ইহাই।

মশহুর বুজুর্গ হযরত আতায়ে ছালামী (রহঃ) সর্বদা আল্লাহর ভয়ে ভীত থাকিতেন। তিনি কখনো আল্লাহ পাকের নিকট জান্নাত কামনা করিতেন না। শুধু বলিতেন, আয় আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও। একবার তিনি অসুস্থ হইয়া পড়িলে লোকেরা তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনার মনে কোন বাসনা থাকিলে বলুন। জবাবে তিনি বলিলেন, দোজখের ভয় আমার মনকে এমনভাবে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে যে, অতঃপর সেখানে আর কোন পার্থিব বাসনা স্থান লইতে পারে নাই। ক্রমাগত চল্লিশ বৎসর তিনি আকাশের দিকে মুখ তুলিয়া তাকান নাই এবং এই সুদীর্ঘ সময় তিনি এক মুহূর্তের জন্যও হাস্য করেন নাই। চল্লিশ বৎসর পর একদিন আকাশের দিকে তাকাইবামাত্র আল্লাহ'র ভয়ে মাটিতে লুটাইয়া পড়িলেন এবং তাহার পেটের অন্ত্র কাটিয়া গেল। তাহার নিয়ম ছিল– রাতের কোন এক সময় তিনি দেহের বিভিন্ন অঙ্গ হাতাইয়া দেখিতেন যে, (গোনাহের কারণে) উহার কোন বিকৃতি ঘটিয়াছে কিনা। তাছাড়া যখন ঝড়-তুফান শুরু হইয়া বজ্রপাত আরম্ভ হইত বা দেশে খাদ্যদ্রব্যের দুর্মূল্য দেখা দিত, তখন তিনি বলিতেন, আমার কারণেই এই আজাব আসিয়াছে। আমার মৃত্যু হইলে মানুষ এই বিপদ হইতে রক্ষা পাইবে।

হযরত আতায়ে ছালামী বর্ণনা করেন, একবার আমার গোলাম ওৎবার সঙ্গে এক সাথে বাহির হইলাম। আমাদের সঙ্গে এমন কয়েকজন যুবক ও বৃদ্ধ ছিল যাহারা এশার নামাজের ওজু দ্বারা ফজর নামাজ আদায় করিত। রাতের অধিক সময় দণ্ডায়মান থাকার কারণে তাহাদের পা স্ফীত, চক্ষু কোটরাগত এবং দেহের চামড়া হাড়ের সঙ্গে মিশিয়া একেবারে জীর্ণ-শীর্ণ হইয়া গিয়াছিল। তাহাদিগকে দেখিলে মনে হইত যেন এই মাত্র তাহারা কবর হইতে উঠিয়া আসিয়াছে। তাহারা বলিত, আল্লাহ পাক তাঁহার অনুগত বান্দাদিগকে ইজ্জত দান করিয়াছেন এবং নাফরমানদিগকে অপমানিত করিয়াছেন। এইভাবেই তাহাদের দিন কাটিতেছিল।

পথ অতিক্রমকালে এক স্থানে আসিয়া তাহাদের মধ্য হইতে এক ব্যক্তি হঠাৎ অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। সঙ্গীরা তাহাকে ঘিরিয়া কান্না শুরু করিয়া দিল। সময়টি ছিল প্রচণ্ড শীত মৌসুম। কিন্তু সংজ্ঞাহীন লোকটির কপাল

হইতে ঘাম বাহিয়া পড়িতেছিল। কিছুক্ষণ পর তাহার মুখে পানির ছিটা দিলে সে চৈতন্য ফিরিয়া পাইল। পরে তাহাকে ঘটনার কারণ জিজ্ঞাসা করা হইলে সে বলিল, একবার এই স্থানে আমি আল্লাহর নাফরমানী করিয়াছিলাম। আজ এখানে আসিয়া সেই গোনাহের কথা স্মরণ হইতেই ভয়ে আমার সংজ্ঞা লোপ পায়।

হযরত ছাহেল মুররী (রহঃ) বলেন, আমি এক জাহেদ ব্যক্তির নিকট নিম্নের আয়াতটি পাঠ করিলাম–

يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوْهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُوْلُوْنَ يَا لَيْتَنَا اَطَعْنَا اللّٰهَ وَ اَطَعْنَا الرَّسُوْلَ

অর্থাৎ– যেই দিন অগ্নিতে তাহাদের মুখমণ্ডল ওলটপালট করা হইবে; সেই দিন তাহারা বলিবে, হায়! আমরা যদি আল্লাহর আনুগত্য করিতাম, রাসূলের আনুগত্য করিতাম।

উপরোক্ত আয়াত শোনার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি অজ্ঞান হইয়া পড়িয়া গেল। কিছুক্ষণ পর তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসিলে সে বলিল, হে ছালেহ! তুমি আরো কিছু তেলাওয়াত কর, আমার বড় কষ্ট হইতেছে। হযরত ছালেহ্ বলেন, অতঃপর আমি তাহার অনুরোধক্রমে নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করিলাম–

كُلَّمَا اَرَادُوْا اَنْ يَّخْرُجُوْا مِنْهَا اُعِيْدُوْا فِيْهَا وَ قِيْلَ لَهُمْ ذُوْقُوْا عَذَابَ النَّارِ الَّذِيْ كُنْتُمْ بِهٖ تُكَذِّبُوْنَ *

অর্থাৎ– যখন তাহারা উহা হইতে বাহির হইতে চাহিবে (এবং কুলের দিকে অগ্রসর হইবে) তখন তাহারা পুনঃ উহাতে নিক্ষিপ্ত হইবে এবং তাহাদিগকে বলা হইবে, দোজখের সেই আজাব আস্বাদন কর, যাহাকে তোমরা অবিশ্বাস করিতে।

উপরোক্ত আয়াত শোনার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি মাটিতে পড়িয়া ইন্তেকাল করিল।

জুরারা ইবনে আবী ওফা ফজরের নামাজের ইমামতি করিতেছিলেন। যখন নিম্নের আয়াতটি পাঠ করিলেন, তখন সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া ইন্তেকাল করিলেন। আয়াতটি এই–

فَاِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُوْرِ

অর্থাৎ– অনন্তর যখন শিঙ্গায় ফুৎকার দেওয়া হইবে।

একদা ইয়াজীদ রোকাশী হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজের নিকট গমন

করিলে তিনি বলিলেন, হে ইয়াজীদ! আমাকে কিছু নসীহত করুন। তিনি বলিলেন, হে আমীরুল মোমেনীন! এমন নহে যে, খলীফাগণের মধ্যে আপনিই প্রথম মৃত্যুবরণ করিতেছেন। পৃথিবীতে আপনার পূর্বে বহু খলীফা ইন্তেকাল করিয়াছেন। খলীফা অশ্রু বর্ষণ করিয়া বলিলেন, আমাকে আরো কিছু নসীহত করুন। তিনি বলিলেন, আমীরুল মোমেনীন! আদম (আঃ) ও আপনার মাঝে এমন কোন বুজুর্গ ব্যক্তি নাই যিনি ইহলোক ত্যাগ করেন নাই। খলীফা এইবারও অশ্রু ত্যাগ করিয়া বলিলেন, আমাকে আরো কিছু উপদেশ দিন। এইবার তিনি বলিলেন, হে খলীফাতুল মোসলেমীন! আপনার এবং বেহেশত ও দোজখের মধ্যখানে কোন মনজিল নাই। এই কথা শুনিবার সঙ্গে সঙ্গে খলীফা সংজ্ঞা হারাইয়া ফেলিলেন।

একদা হযরত দাউদ তায়ী (রহঃ) দেখিতে পাইলেন, এক মহিলা তাহার ছেলের কবরের পাশে বসিয়া ক্রন্দন করিয়া বলিতেছে, বৎস! আমার জানা নাই যে, তোমার কোন্ গালটিতে পোকায় প্রথম আক্রমণ করিয়াছে। মহিলার এই কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গে হযরত দাউদ (রহঃ) অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেলেন।

একবার হযরত সুফিয়ান ছাউরী (রহঃ) অসুস্থ হইয়া পড়িলে হাকীম তাহার প্রস্রাব পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, অত্যধিক ভয়ের কারণে রোগীর যকৃত ফাটিয়া গিয়াছে। অতঃপর তাহার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া হাকীম মন্তব্য করিলেন, ইতিপূর্বে কোন মুসলমানকে আমি এইরূপ দেখিতে পাই নাই।

হযরত আব্দুল্লাহ বিন ওমর ইবনুল আস (রাঃ) বলেন, তোমরা ক্রন্দন কর। যদি ক্রন্দন না আসে, তবে অন্ততঃ উহার ছুরত ধারণ কর। ঐ পাক জাতের কসম! যাহার আয়ত্বে আমার অন্তর; তোমরা যদি এই বিষয়টি উপলব্ধি করিতে পার, তবে এমনভাবে চিৎকার করিবে যে, তোমাদের গলা ফাটিয়া যাইবে। তিনি এই বক্তব্য দ্বারা যেন নিম্নের হাদীসটির প্রতিই ইশারা করিয়াছেন–

لَوْ تَعْلَمُوْنَ مَا اَعْلَمُ فَضَحِكْتُمْ قَلِيْلًا وَ لَبَكَيْتُمْ كَثِيْرًا

অর্থাৎ– আমি যাহা জানি তাহা যদি তোমরা জানিতে পারিতে, তবে কম হাসিতে এবং অধিক রোদন করিতে।

আম্বরী বর্ণনা করেন, একদা হাদীস বিশারদগণ হযরত ফোজায়েল ইবনে আয়াসের দরজায় আসিয়া হাজির হইলেন। হযরত ফোজায়েল জানালা দিয়া মাথা বাহির করিয়া তাহাদের দিকে তাকাইলেন। আগন্তুকগণ দেখিতে

পাইলেন, হযরত ফোজায়েলের চোখ হইতে অশ্রু ঝরিতেছে এবং তাহার দাড়ী নড়চড়া করিতেছে। তিনি সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, ভাইসকল! কোরআনের উপর যথারীতি আমল কর এবং নিয়মিত নামাজ আদায় কর। ইহা হাদীসের সময় নহে, বরং ইহা রোনাজারী, অসহায়ত্ব এবং ডুবন্ত ব্যক্তির মত দোয়া করার সময়। বর্তমানে মানুষের কর্তব্য হইল– জবানের হেফাজত করা, নিজের ভেদ প্রকাশ না করা এবং স্বীয় নফসের এলাজ করা। যাহা জানিতে পারিয়াছ উহার উপর আমল কর এবং যেই বিষয়ে সুস্পষ্ট ধারণা নাই উহা বর্জন কর।

একবার তিনি অতিশয় খওফের কারণে উদ্ভ্রান্তের মত সামনে আগাইতেছিলেন। কেহ তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল, আপনি কোথায় যাইতেছেন? তিনি বলিলেন, কোথায় যাইতেছি তাহা আমার জানা নাই।

হযরত যুর বিন ওমর (রহঃ) স্বীয় পিতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, অন্য কেহ ওয়াজ-নসীহত করিলে মানুষের চোখে পানি আসে না, অথচ আপনার ওয়াজ শুরু হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে চতুর্দিক হইতে কান্নার শব্দ আসিতে থাকে, ইহার কারণ কি? তিনি জবাব দিলেন, যেই মহিলার সন্তান মৃত্যুবরণ করিয়াছে সেই সন্তানহারা জননীর কান্না আর পয়সার বিনিময়ে রোদনকারীনীর কান্না কখনো এক হইতে পারে না। এই উদাহরণটির মাঝেই তোমার প্রশ্নের জবাব খুঁজিয়া লও।

জনৈক আবেদ এক স্থানে দাঁড়াইয়া রোদন করিতেছিলেন। এই সময় কতিপয় ব্যক্তি তাহার সম্মুখে আসিয়া আরজ করিল, আল্লাহ আপনার উপর রহম করুন, আপনি কি কারণে এমন করিয়া কাঁদিতেছেন? জবাবে আবেদ বলিলেন, খওফের কারণে। খওফকারীগণ নিজেদের অন্তরে ইহা প্রাপ্ত হয়। লোকেরা জিজ্ঞাসা করিল, উহা কিসের খওফ? আবেদ বলিলেন, আল্লাহর সম্মুখে হাজির হওয়ার জন্য যেই ডাক আসিবে, উহার খওফ।

অন্য এক বুজুর্গ কাঁদিয়া কাঁদিয়া মোনাজাত করিতেন এবং বলিতেন, আয় পরওয়ারদিগার! আমি বৃদ্ধ হইয়া গিয়াছি, দেহটি আমার অতিশয় দুর্বল, তোমার এবাদত করিতে পারিতেছি না। সুতরাং এইবার আমাকে মুক্তি দাও।

সাত জন আবেদের ঘটনা

হযরত ছাহেল মুররী বলেন, একদা হযরত ইবনে ছাম্মাক আমার নিকট আসিয়া বলিলেন, আমাকে আবেদগণের কিছু বিস্ময়কর অবস্থা দেখাও। হযরত ছালেহ বলেন, আমি তাহাকে পাশ্ববর্তী এক মহল্লায় লইয়া গেলাম। সেখানে এক কুঁড়ে ঘরে এক বৃদ্ধ থাকিত। আমরা সেখানে গিয়া তাহার অনুমতি লইয়া ঘরের ভিতরে প্রবেশ করিয়া দেখিতে পাইলাম, লোকটি বসিয়া বসিয়া চাটাই বুনন করিতেছে। আমি তাহার নিকটে গিয়া নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করিলাম–

اِذَ الْاَغْلَال فِي اَعْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِل يَسْحَبُوْنَ * فِي الْحَمِيْمِ ثُمَّ فِي النَّارِ يَسْحَبُوْنَ *

অর্থাৎ– যখন তাহাদের গ্রীবাদেশে বেড়ী এবং শিকল লাগিবে, তাহাদিগকে হেঁচড়াইয়া নেওয়া হইবে, ফুটন্ত পানির মধ্যে, অতঃপর তাহাদিগকে আগুনে বিদগ্ধ করা হইবে।

উপরোক্ত আয়াত শোনার সঙ্গে সঙ্গে লোকটি চিৎকার দিয়া অজ্ঞান হইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। আমরা তাহাকে ঐ অবস্থায় রাখিয়া তথা হইতে বাহির হইয়া অন্য এক ব্যক্তির ঘরে গিয়া প্রবেশ করিলাম। সেখানেও আমি ঐ একই আয়াত পাঠ করিলাম এবং লোকটি ঐ আয়াত শোনার সঙ্গে সঙ্গে সংজ্ঞা হারাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। অতঃপর আমরা তৃতীয় এক ঘরে গিয়া ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলে ভিতর হইতে আওয়াজ আসিল, যদি আমাকে আমার মওলার ইবাদত হইতে বিরত না কর, তবে প্রবেশ করিতে পার। পরে আমরা ভিতরে প্রবেশ করিয়া তাহার নিকট আমি নিম্নের আয়াতটি তেলাওয়াত করিলাম–

ذَالِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِيْ وَخَافَ وَعِيْد *

অর্থাৎ– ইহা উহাদের প্রত্যেকের জন্য, যাহারা আমার সম্মুখে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় রাখে, এবং আমার শাস্তিকে ভয় করে।

উপরোক্ত আয়াত শুনিবামাত্র লোকটি চৈতন্য হারাইয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। অতঃপর তাহার নাক হইতে রক্ত বাহির হইতে লাগিল এবং সে রক্তাপ্লুত অবস্থায় তড়পাইতে লাগিল। কিছুক্ষণ পর তাহার রক্তক্ষরণ বন্ধ হইলে আমরা তথা হইতে বাহির হইয়া অন্যত্র চলিলাম।

হযরত ছালেহ বলেন, এমনিভাবে আমি ইবনে ছাম্মাককে পরপর ছয়জনের নিকট লইয়া গেলাম এবং সকলকেই অজ্ঞান অবস্থায় রাখিয়া চলিয়া আসিলাম। অবশেষে আমি তাহাকে লইয়া সপ্তম ঘরে গিয়া ভিতরে প্রবেশের অনুমতি চাহিলাম। ভিতর হইতে এক বৃদ্ধা মহিলা জবাব দিল, ভিতরে চলিয়া আস। সেখানে গিয়া আমরা দেখিতে পাইলাম, এক অতিশয় বৃদ্ধ জায়নামাজে বসিয়া আছে। আমি তাহাকে ছালাম দিলাম। কিন্তু তাহার পক্ষ হইতে কোন সাড়া পাওয়া গেল না। এইবার আমি উচ্চস্বরে বলিলাম, খবরদার! একদিন সকলকেই দাঁড়াইতে হইবে। সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধ রাগিয়া উঠিয়া বলিল, হতভাগা! কাহার সম্মুখে? এই পর্যন্ত বলার পরই সে মুখ হা করিয়া বিস্ফারিত নেত্রে স্তব্ধ হইয়া গেল। অতঃপর তাহার মুখ হইতে ক্ষীণ স্বরে শুধু কয়েকটি গোঙ্গানির শব্দ শোনা গেল। এই সময় বৃদ্ধা আগাইয়া আসিয়া বলিল, এখন তোমরা তাহার নিকট হইতে চলিয়া যাও। এখানে থাকিয়া আর কোন লাভ হইবে না। কারণ, এখন তাহার হালাত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে।

হযরত ছালেহ বলেন, উপরোক্ত ঘটনার কিছু দিন পর আমি পুনরায় সেই মহল্লায় গিয়া লোকজনের নিকট ঐ সাত ব্যক্তির অবস্থা জিজ্ঞাসা করিলে তাহারা বলিল, সাতজনের মধ্যে তিন জন সুস্থ হইয়াছে এবং তিন জন ইন্তেকাল করিয়াছে। আর সেই বৃদ্ধ ক্রমাগত তিন দিন একই অবস্থায় পড়িয়াছিল। এই সময় তাহার ফরজসমূহও ছুটিয়া গিয়াছিল। তিন দিন পর তাহার চৈতন্য ফিরিয়া আসে।

অপর এক বিবরণে প্রকাশঃ ইয়াজীদ ইবনুল আসওয়াদকে মানুষ আবদালের মধ্যে গণ্য করিত। একবার তিনি এই মর্মে শপথ করিলেন যে, জীবনে আর কখনো হাসিবেন না, বিছানায় শুইয়া নিদ্রা গ্রহণ করিবেন না এবং ঘৃতপক্ক খাদ্য গ্রহণ করিবেন না। হযরত ইয়াজীদ ইবনুল আসওয়াদ মৃত্যু পর্যন্ত এই কসমের উপর কায়েম ছিলেন।

একদা হাজ্জাজ সাঈদ ইবনে জোবায়েরের নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, আমি শুনিতে পাইলাম, তুমি নাকি কখনো হাস না, ইহার কারণ কি? জবাবে তিনি বলিলেন, দোজখের আগুন প্রজ্বলিত করা হইয়াছে। দোজখের বেড়ীও বানাইয়া রাখা হইয়াছে, আর দোজখের ফেরেশতাগণ সর্বদা প্রস্তুত হইয়া আছে; এমতাবস্থায় আমি কেমন করিয়া হাসিব?

হযরত হাসান বসরীর হালাত

এক ব্যক্তি হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-কে জিজ্ঞাসা করিল, হে আবু সাঈদ! আপনি সকাল পর্যন্ত কি অবস্থায় কাটান? তিনি সংক্ষেপে জবাব দিলেন, ভাল অবস্থায়। লোকটি পুনরায় বলিল, আপনার সেই অবস্থাটির বিবরণ দিন। হযরত হাসান মৃদু হাস্য করিয়া বলিলেন, তুমি আমার অবস্থা জিজ্ঞাসা করিতেছ? তুমি নিজেই বল, কয়েক ব্যক্তি একটি নৌকায় আরোহণ করিয়া গভীর সমুদ্রে যাওয়ার পর যদি উহা নিমজ্জিত হয়, অতঃপর যাত্রীগণ নৌকার এক একটি পাটাতন অবলম্বন করিয়া যদি কোনক্রমে পানিতে ভাসিয়া থাকে, ঐ সময় তাহাদের মনের উপর কেমন অবস্থা বিরাজ করিবে? লোকটি জবাব দিল, ঐ সময় তো তাহারা ভয়াবহ সঙ্কটকাল অতিক্রম করিবে। এই বার হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলিলেন, আমার অবস্থা তাহাদের বিপদ অপেক্ষা আরো কঠিন সঙ্কটাপন্ন।

একদা হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বলেন, এক ব্যক্তি এক হাজার বৎসর পর দোজখ হইতে মুক্তি পাইবে। এই উক্তির পর তিনি বলিলেন, কতইনা ভাল হইত যদি সেই ব্যক্তি আমি হইতাম। হযরত হাসান বসরীর এই মন্তব্যের কারণ হইল তিনি নিজের ব্যাপারে সর্বদা এই আশঙ্কা করিতেন যে, আল্লাহ পাকের নাফরমানীর কারণে হয়ত তিনি ঈমানহারা অবস্থায় ইন্তেকাল করিবেন এবং চির দিন জাহান্নামের আজাব ভোগ করিবেন।

অথচ হযরত হাসান বসরীর পরহেজগারীর কথা উল্লেখ করিয়া বলা হয়, তিনি ক্রমাগত চল্লিশ বৎসর এক মুহূর্তের জন্য হাস্য করেন নাই। বর্ণনাকারী বলেন, আমি যখন তাহাকে বসা অবস্থায় দেখিতাম, তখন মনে হইত যেন তিনি একজন কয়েদী এবং অল্প কিছুক্ষণ পরই তাহার শিরচ্ছেদ করা হইবে। এমনিভাবে তিনি যখন ওয়াজ করিতেন, তখন মনে হইত যেন তিনি আখেরাতের অবস্থাসমূহ স্বচক্ষে দেখিয়া দেখিয়া উহার বিবরণ শোনাইতেছেন। আর যখন চুপচাপ বসিয়া থাকিতেন, তখন মনে হইত যেন তিনি দোজখের প্রজ্বলিত অগ্নি প্রত্যক্ষ করিতেছেন।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ)-এর এই ভয়-ভীতি ও শঙ্কিত অবস্থায় বিস্ময় প্রকাশ করিয়া কেহ তাহাকে প্রশ্ন করিলে তিনি বলিলেন, হাশরের দিন আল্লাহ পাক যদি আমার কোন অপরাধের উল্লেখ করিয়া বলেন- "যাও, তোমাকে ক্ষমা করা হইবে না"- তাহা হইলে আমার জীবনের সকল আমলই বরবাদ হইয়া যাইবে। এই আশঙ্কার কারণেই আমি সর্বদা ভীত সন্ত্রস্ত থাকি।

একটি স্বপ্ন

হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (রহঃ)-এর এক দাসী তাঁহার খেদমতে আসিয়া ছালাম আরজ করিল। অতঃপর সে ঘরের ভিতর অবস্থিত নামাজের নির্দিষ্ট স্থানে গিয়া দুই রাকাত নামাজ আদায়ের পর সেখানেই ঘুমাইয়া পড়িল। অতঃপর সে একটা দুঃস্বপ্ন দেখিয়া ঘুমের মধ্যেই ক্রন্দন করিতে লাগিল। ঘুম হইতে জাগ্রত হওয়ার পর সে খলীফার খেদমতে আসিয়া আরজ করিল, হে আমীরুল মোমেনীন! এই মাত্র আমি একটি আশ্চর্য স্বপ্ন দেখিয়াছি। খলীফা বলিলেন, কি স্বপ্ন দেখিয়াছ বল। দাসী বলিল, আমি দেখিতে পাইলাম দোজখ উহার অধিবাসীদের জন্য দাউ দাউ করিয়া প্রজ্বলিত হইতেছে। অতঃপর একটি সেতু স্থাপন করা হইল।

খলীফা জিজ্ঞাসা করিলেন, অতঃপর? দাসী বলিল, অতঃপর আব্দুল মালেক বিন মারওয়ানকে আনিয়া ঐ সেতুর উপর আরোহণ করানো হইল। কিন্তু তিনি কিছু দূর অগ্রসর হওয়ার পরই সেতু উল্টাইয়া নীচের দোজখে পতিত হইলেন। খলীফা শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, অতঃপর? সে বলিল, অতঃপর আব্দুল মালেকের ছেলে ওলীদকে আনা হইল। কিন্তু সেতুর উপর আরোহণ করিয়া কিছু দূর অগ্রসর হইবার পরই সেতুটি কাত হইলে সে দোজখে পতিত হইল।

খলীফা পূর্বাপেক্ষা অধিক বিচলিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, উহার পর কি দেখিলে বল। দাসী বলিল, এইবার সুলাইমান বিন মালেককে পুলের উপর আনা হইল। কিন্তু তিনিও কিছু দূর আগাইবার পর পুল হইতে নীচের দোজখে পড়িয়া গেলেন। গভীর উৎকণ্ঠায় খলীফার মন হায় হায় করিয়া উঠিল এবং তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, অতঃপর আর কি দেখিলে বল। দাসী আরজ করিল, অতঃপর আমি দেখিতে পাইলাম, সেখানে আপনাকে আনা হইল ..... দাসী এই পর্যন্ত বলিবামাত্র খলীফা বিকট স্বরে চিৎকার দিয়া চৈতন্য হারাইয়া লুটাইয়া পড়িলেন। দাসী যারপর নাই বিচলিত হইয়া সহসা খলীফার কানের নিকট গিয়া চিৎকার করিয়া বলিতে লাগিল, হে আমীরুল মোমেনীন! আল্লহর শপথ, আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম, আপনি দোজখ হইতে মুক্তি পাইলেন এবং নির্বিঘ্নে সেই পুল অতিক্রম করিয়া গেলেন। কিন্তু দাসী যতই চিৎকার করিয়া উহা বলিল, খলীফা তাহার কথা শুনিতে পাইল বলিয়া মনে হইল না। তিনি মাটিতে পা আছড়াইয়া ক্রমাগত চিৎকার করিতে লাগিলেন।

হযরত মোয়াজ বিন জাবাল (রাঃ) বলেন, মোমেনের খওফ ও ভয় ততক্ষণ দূর হয় না, যতক্ষণ না দোজখের পুলকে সে পশ্চাতে অতিক্রম করিয়া আসে।

হযরত ইবনে সাম্মাকের ওয়াজ

হযরত ইবনে সাম্মাক বলেন, একবার আমি এক মজলিসে ওয়াজ করিতেছিলাম। ওয়াজ শেষে মজলিস হইতে এক যুবক আসিয়া আমাকে বলিল, বয়ানের মধ্যে আজ আপনি এমন একটি বাক্য ব্যবহার করিয়াছেন যে, ঐ একটি বাক্যই আমার জন্য যথেষ্ট হইয়াছে। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, ঐ বাক্যটি কি? যুবক বলিল, আপনি বলিয়াছেন, মোমেনের অন্তরে "স্থায়ী নিবাসের দুইটি ভাবনা" অর্থাৎ পরকালে আমার স্থায়ী নিবাস কোথায় হইবে, জান্নাতে না জাহান্নামে।

হযরত ইবনে সাম্মাক বলেন, এই কথা বলিয়াই যুবক চলিয়া গেল। পরবর্তী কোন মাহ্ফিলে আর তাহাকে খুঁজিয়া পাওয়া গেল না। পরে আমি লোকজনের নিকট সন্ধান করিয়া জানিতে পারিলাম, যুবক অসুস্থ। এই সংবাদ পাওয়ার পর আমি তাহার খোঁজখবর লওয়ার উদ্দেশ্যে তাহার বাড়ীতে গেলাম। যুবকের শয্যাপাশে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, ভাই! তুমি এখন কেমন আছ? আমার কথা শুনিয়া যুবক যেন কিছুটা উৎফুল্ল হইল। সে বলিল, হে আবু আব্বাস! আপনার সেই বাক্যটির কারণেই আমি এই সুযোগ লাভ করিয়াছি। অর্থাৎ "স্থায়ী নিবাসের দুইটি ভাবনা"।

হযরত ইবনে সাম্মাক বলেন, পরে সেই যুবক ঐ ব্যাধিতেই ইন্তেকাল করিল। ইন্তেকালের পর তাহাকে আমি স্বপ্নে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, আল্লাহ পাক তোমার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করিয়াছেন? সে বলিল, আল্লাহ পাক অনুগ্রহপূর্বক আমাকে ক্ষমা করিয়া জান্নাত দান করিয়াছেন। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কোন্ আমলের বিনিময়ে তোমার উপর রহম করা হইল? সে বলিল, আপনার সেই বাক্যটির বিনিময়ে।

এক রাহেবের নসীহত

ঈসা বিন মালেক খাওলানী বড় আবেদ ছিলেন। জনৈক রাহেবের ঘটনা বর্ণনা করিয়া তিনি বলেন, ঐ রাহেবকে তিনি বাইতুল মোকাদ্দাসের ফটকে ভিষণ চিন্তামগ্ন ও পেরেশান অবস্থায় দেখিতে পাইয়াছেন। অতিরিক্ত পেরেশানীর কারণে যেন তাহার চোখের পানিও শুকাইয়া গিয়াছিল।

বর্ণনাকারী বলেন, রাহেবের এই অবস্থা দেখিয়া আমি ভয় পাইয়া গেলাম পরে আমি নিকটে গিয়া তাহাকে বলিলাম, হে রাহেব! তুমি আমাকে কি

নসীহত কর, যেন তোমার কথা স্মরণ রাখিতে পারি। জবাবে সে বলিল, বৎস! তোমাকে আমি কি নসীহত করিব। শত কথার মধ্যে একটি কথা হইল- যদি সম্ভব হয় তবে নিজেকে এমন অবস্থায় রাখিবে যেন চতুর্দিক হইতে হিংস্র প্রাণী ও বিষাক্ত কীট তোমাকে বেষ্টন করিয়া আছে। সুতরাং তুমি সর্বদা এমন ভীত-সন্ত্রস্ত ও সতর্ক থাকিবে, যেন সামান্য অবহেলার কারণে উহারা তোমার ক্ষতিসাধন করিতে না পারে। যাহারা অবহেলা ও গাফলতের মধ্যে নিপতিত থাকে, তাহাদের পক্ষেই বে-খওফ ও নির্ভয় থাকা সম্ভব হয়।

অতঃপর সেই রাহেব আমাকে ত্যাগ করিয়া প্রস্থান করিতে উদ্যত হইলে আমি তাহাকে ডাকিয়া বলিলাম, হে রাহেব! তুমি যদি আমাকে আরো কিছু নসীহত করিতে, তবে আমি আরো অধিক উপকৃত হইতাম। রাহেব কহিল, তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি যতটুকু পানি পায় উহাই তাহার জন্য যথেষ্ট হয়। কথাটি সে যথার্থ বলিয়াছে এই কারণে যে, যাহাদের অন্তর সাফ ও স্বচ্ছ; সতর্ক হওয়ার জন্য সামান্য খওফই তাহাদের জন্য যথেষ্ট হয়। পক্ষান্তরে কঠিন ও পাষাণ হৃদয় ব্যক্তিদের জন্য বিস্তর ওয়াজ-নসীহতও কোন কাজে আসে না।

রাহেব যেই হিংস্র প্রাণী ও বিষাক্ত কীট-পতঙ্গের কথা বলিয়াছে, উহাকে নিছক উদাহরণ মনে করা ঠিক হইবে না। কারণ, উহার বাস্তবতাও অনস্বীকার্য। মানুষ যদি অন্তর-দৃষ্টি দ্বারা নিজের বাতেনী অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে, তবে সে স্পষ্ট দেখিতে পাইবে যে, কাম-ক্রোধ, হিংসা-বিদ্বেষ, অহংকার ইত্যাদিরূপ অসংখ্য প্রাণী ও বিষাক্ত কীট দ্বারা সে প্রতিনিয়ত ক্ষত-বিক্ষত হইতেছে। অবশ্য গাফেল ব্যক্তি নিজের এই হালাত কখনো দেখিতে পায় না। কিন্তু মৃত্যুর মাধ্যমে যখন চোখের বাহ্যিক পর্দা সরাইয়া লওয়া হইবে এবং কবরে নিয়া শয়ন করানো হইবে, তখন সেই সকল অবস্থার বাস্তবরূপ এবং উহার প্রতিক্রিয়া অবশ্যই অবলোকন করিতে হইবে। সুতরাং কেহ যদি এই সকল হিংস্র ও বিষাক্ত প্রাণীর আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে চায়, তবে মৃত্যুর পূর্বে যাবতীয় অন্যায়-অপরাধ বর্জন করিয়া নেক আমলে ব্রতী হওয়ার মাধ্যমেই উহা সম্ভব। অন্যথায় নিশ্চিতভাবেই একদিন এই ভয়াবহ অবস্থার শিকার হইতে হইবে।

উপরের সুদীর্ঘ আলোচনায় আম্বিয়া, আউলিয়া, ওলামা ও সৎকর্মপরায়ন ব্যক্তিবর্গের খওফের হালাত উপস্থাপন করা হইল। তাহাদের মত নৈকট্যশীল ব্যক্তিগণই যদি এতটা খওফ করিয়া থাকেন, তবে আমাদের পক্ষে তো আরো অধিক খওফ করা আবশ্যক। ইহা জরুরী নহে যে, গোনাহ বেশী হইলে খওফ

করিতে হইবে। বরং অন্তর যদি গোনাহখাতা হইতে পরিষ্কার হয় এবং মারেফাতও পরিপূর্ণ হয়, তবে সেই ক্ষেত্রেও খওফ করা বাঞ্ছনীয়। বেশী বেশী এবাদত ও গোনাহের স্বল্পতা ভয়হীনতা দাবী করে না। বরং মানুষ যখন কাম-প্রবৃত্তির আনুগত্য, দুর্ভাগ্যের প্রাবল্য এবং অন্তর গাফেল ও কঠোর হওয়ার অবস্থার শিকার হইয়া নিজের অবস্থা উপলব্ধি করিতে ব্যর্থ হয়; ঠিক তখনই তাহার মধ্যে ভয়হীন অবস্থা বিরাজ করে। এই শ্রেণীর লোকেরা মৃত্যু নিকটবর্তী হওয়ার পরও যেমন সতর্ক হয় না, ঠিক তেমনি গোনাহের আধিক্যের কারণেও তাহাদের অন্তরে অনুশোচনার কম্পন আসে না। আর খওফকারীদের হালাত দেখিয়াও তাহারা কোন শিক্ষা গ্রহণ করে না। তদুপরি অমঙ্গলজনক মৃত্যুর আশঙ্কাকেও তাহারা আমলে আনে না। এমতাবস্থায় কেবল আল্লাহর খাছ অনুগ্রহের মাধ্যমেই আমাদের এছলাহ ও সংশোধন হওয়া সম্ভব। সুতরাং এই এছলাহের জন্য আমরা আল্লাহ পাকের নিকট দোয়া করিব। কিন্তু নিছক মৌখিক দোয়া যেহেতু কবুল হয় না, সুতরাং উহার জন্য সম্ভাব্য সকল প্রকার চেষ্টাও চালাইয়া যাইতে হইবে।

দুনিয়াতে আমরা যখন ধন-সম্পদ সঞ্চয়ের এরাদা করি, তখন উহার জন্য কত ধরনের চেষ্টা-তদ্বিরে আত্মনিয়োগ করি। ক্ষেতে হাল চালাই, জমিনে জীব বপন করি, ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে জল-স্থল ও অন্তরীক্ষে কত বিপদ সঙ্কুল অবস্থার মুখোমুখি হই। শিক্ষাক্ষেত্রে কোন উচ্চ ডিগ্রী লাভ করিতে চাহিলে উহার জন্য কত বিপুল সাধনা করি, বিবিধ বিষয়ের উপর গভীর অধ্যয়নে কত বিনিদ্র রজনী কাটাইয়া দেই, জীবিকার অন্বেষণে কত ধরনের মেহনত করি। অথচ আল্লাহ পাক রিজিকের ওয়াদা করিয়াছেন, কিন্তু আমরা কেহই আল্লাহর এই ওয়াদার উপর বিশ্বাস করিয়া হাত গুটাইয়া বসিয়া থাকি না। কোন প্রকার চেষ্টা-তদ্বীর না করিয়া বিকলাঙ্গ সাজিয়া ঘরে বসিয়া থাকিয়া এমন দোয়া করি না যে, আয় আল্লাহ! আমাকে রিজিক দান কর। অথচ পরকালের প্রশ্নে আসিয়াই যত বিপত্তি। পরকালের অন্তহীন জীবনের চির সুখ-শান্তি লাভ করার জন্য আমরা কেবল মুখে এতটুকু বলিয়াই ক্ষান্ত হই যে, আয় আল্লাহ! তুমি আমাকে ক্ষমা করিয়া দাও, আয় আল্লাহ! তুমি আমার উপর রহম কর। অথচ এই বিষয়ে স্বয়ং আল্লাহ পাক বলিতেছেন–

وَاَنْ لَّيْسَ لِلْاِنْسَانِ اِلَّا مَا سَعٰى

অর্থাৎ– এবং মানুষ তাহাই পায়, যাহা সে করে।

সুতরাং আমরা যেন আল্লাহর ব্যাপারে এইরূপ ধোঁকায় পড়িয়া না থাকি যে,

কোন প্রকার চেষ্টা না করিয়া কেবল তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলেই তিনি তাহা কবুল করিবেন। কালামে পাকে এরশাদ হইয়াছে–

وَلَا يَغُرَّنَّكُمْ بِاللّٰهِ الْغَرُوْرُ

অর্থাৎ– তোমাদিগকে প্রতারক শয়তান যেন আল্লাহর নামে ধোঁকা না দেয়।

অন্যত্র এরশাদ হইয়াছে–

يٰاَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيْمِ

অর্থাৎ– হে মানুষ! কিসে তোমাকে তোমার মহামহিম পালনকর্তা সম্পর্কে বিভ্রান্ত করিল?

কালামে পাকের এই বাণীর প্রতি যদি আমরা লক্ষ্য করি, তবে অবশ্যই আমরা মিথ্যা বিভ্রান্তি এবং অমূলক আশা হইতে রেহাই পাইতে পারি। আমরা দোয়া করি, আল্লাহ পাক যেন আমাদের অন্তরে তওবার আগ্রহ পয়দা করিয়া দেন এবং আমাদের তওবা কবুল করেন। আর নিছক মৌখিক তওবা করিয়াই যেন আমরা ক্ষান্ত না হই। অন্যথায় আমরাও সেই সকল ব্যক্তিদের অন্তর্ভুক্ত হইব, যাহারা কথা বলে কিন্তু কাজ করে না, কানে শোনে, কিন্তু উহার উপর আমল করে না, ওয়াজ-নসীহত শুনিয়া কাঁদিয়া ফেলে, কিন্তু আমল করার সময় আসিলে গা বাঁচাইয়া রাখে। ইহা হইতে দুর্ভাগ্যের কথা আর কি হইতে পারে? এখন আমি এই প্রসঙ্গটি শেষ করিতেছি। আল্লাহ পাক স্বীয় ফজল ও করমে আমাদিগকে হেদায়েত নসীব করুন।

।। আল্লাহর অপার অনুগ্রহে সমাপ্ত ।।